পঞ্চতন্ত্রের
গল্প
ওরিয়েন্ট
বুক কোম্পানি

প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৫

Published by Sri Prahlad Kumar Pramanik from Orient Book Company, C 29-31, College Street Market, First floor, Calcutta-700 007 and Printed by K. C. Pal, at Nabajiban Press, 66, Grey Street, Calcutta-700 006.

সম্পাদকের নিবেদন

দাক্ষিণাত্যের এক রাজা অমরশক্তি তাঁর চার পুত্রের শিক্ষার ভার দিয়েছিলেন মহামতি বিষ্ণুশর্মার উপর। বিষ্ণুশর্মা 'পঞ্চতন্ত্র' রচনা করে রাজকুমারদের নীতিশিক্ষা দিয়েছিলেন। সে এখন থেকে দেড় হাজার বছর আগের কথা। তখন থেকেই পঞ্চতন্ত্রের নীতিগল্পগুলি পৃথিবীর, বিশেষ করে ভারতের, মানুষকে নীতিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে আসছে।

এই নীতিগল্পগুলি বিভিন্ন আকারে বাংলা সাহিত্যে ইতস্তত ছড়ানো থাকলেও কোনও একটি বইয়ে একত্র সেগুলি সংকলিত করা হয়নি। সে অভাব দূর করার জন্যই এই বই।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প জুড়ে মূল আখ্যায়িকাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় ক'রে তোলা ছিল সেকালের গল্পগাথা রচনার একটি বিশেষ রীতি। সেই রীতিতেই পঞ্চতন্ত্র রচিত।

অল্পবয়স্ক পাঠকদের সুবিধার জন্য আমরা প্রত্যেকটি উপগল্প পৃথক পৃথক শিরোনামা দিয়ে এই বইয়ে সন্নিবেশ করেছি।

প্রত্যেক উপগল্পের শেষেই আবার শুরু হয়েছে মূল গল্পের বা তার পরবর্তী উপগল্পের অনুবৃত্তি। গল্পপরি-বেশনের এই বিশেষ রীতিটি মনে রেখে পড়লে গল্পের খেই হারানোর ভয় নেই।

সম্পাদক

সূচীপত্র

পঞ্চতন্ত্রের সূচনা: বিষ্ণুশর্মার প্রতিজ্ঞা

অনেক, অনেকদিন আগেকার কথা।...

সে সময়ে দক্ষিণ ভারতে এক বিশাল রাজ্য ছিল। সে-রাজ্যের নাম 'মহিলারোপ্য'। রাজ্য যেমন বড়, তার রাজাও তেমনি বড়। মহিলারোপ্যের রাজার নাম অমরশক্তি। অমরশক্তি শুধু বড় রাজাই ছিলেন না, তাঁর বড় গুণও ছিল। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, গুণী, সকল শাস্ত্রে পারদর্শী, অপরদিকে তেমনি ছিলেন বীর যোদ্ধা। বাহুবলে কত দেশ জয় করে তিনি নিজরাজ্যের সীমা ও সম্পদ বাড়িয়েছিলেন!

এত বড় রাজা হয়েও তাঁর মনে সুখ ছিল না।

একদিন পাত্রমিত্র নিয়ে রাজা অমরশক্তি সভায় বসে ছিলেন। বিচক্ষণ মন্ত্রীরা আর অভিজ্ঞ অমাত্যেরা তাঁকে রাজকার্যে সাহায্য করছিলেন। প্রহরিবেষ্টিত বন্দীরা রাজার জয়ধ্বনি করছিল, বিচারপ্রার্থী প্রজারা রাজার ন্যায়বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করছিল। কিন্তু সকলে লক্ষ্য করলেন, আজ যেন রাজকার্যে রাজার তেমন উৎসাহ নেই, কিসের চিন্তায় যেন তিনি গুরুতর রাজকার্যেও অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছেন। বৃদ্ধমন্ত্রী সুমতি এই ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন। রাজাকে চিন্তিত ও দুঃখিত দেখে তিনি বললেন, 'মহারাজ, আপনার শরীর ও মন সুস্থ নয় মনে হচ্ছে।'

রাজা বললেন, 'মন্ত্রী, আপনার অনুমান সত্য। সত্যি আমার মন আর শরীর সুস্থ নয়।'

ব্যথিত হয়ে সুমতি বললেন, 'মহারাজ, আমি রাজবৈদ্যকে আনতে লোক পাঠাচ্ছি। ঈশ্বর আপনাকে সুস্থ করুন।'

ম্লান হেসে রাজা বললেন, 'মন্ত্রিবর, আপনি আমার পরম হিতৈষী। কিন্তু এ বৈদ্যের কাজ নয়। এ-চিকিৎসা বৈদ্যের দ্বারা হবে না।'

উৎসুক হয়ে সকলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ, কী আপনার অসুস্থতা, যা রাজবৈদ্যও সারাতে পারবেন না?'

রাজা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমার তিনটি আকাট মূর্খ ও নীতিজ্ঞানহীন পুত্রই এই অসুস্থতার কারণ। এই তিনটি মূর্খ পুত্রের কথা যখন মনে পড়ে, তখন এই রাজকার্য, এই প্রজাপালন, এই সংসার আমার ভালো লাগে না। এর চেয়ে অপুত্রক হওয়াও ঢের ভালো ছিল।'

মন্ত্রীরা সকলে বললেন, 'মহারাজ, এমন কথা বলবেন না।'

রাজা আবার বললেন, 'মন্ত্রিগণ, পণ্ডিতরাই বলে গেছেনঃ

অজাতমৃতমূর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ সুতৌ বরম্।
যতস্তৌ স্বল্পদুঃখায় যাবজ্জীবং জড়ো দহেৎ॥

অর্থাৎ, অপুত্রক হওয়া ভালো, বরং জাতপুত্র মরে যায়--সেও ভালো. কিন্তু মূর্খ পুত্র ভালো নয় ; কেননা, যতদিন জীবিত থাকা যায়, ততদিন মূর্খ পুত্র কেবল ক্লেশই দেয়।'

তখন বৃদ্ধমন্ত্রী সুমতি বললেন, 'মহারাজ যথার্থই বলেছেন। মূর্খ পুত্রের চেয়ে অপুত্রক হওয়া হয়তো ভালোই। কিন্তু কুমারগণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।'

বিরক্ত হয়ে রাজা বললেন, 'মন্ত্রিবর, আমার বেতন-ভোগী পাঁচশত পণ্ডিত আছেন। তাঁরা চেষ্টা করে যদি পুত্রদের শিক্ষিত করে তুলতে না পেরে থাকেন, তবে কেমন করে তাদের শিক্ষা হবে, আর কেই বা তাদের শিক্ষা দেবেন?'

মন্ত্রী-মশাই গম্ভীরভাবে বললেন, 'মহারাজ, এ-সংসারে শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্ত নেই, কিন্তু মানুষের পরমায়ু সীমাবদ্ধ। কাজেই সকলের পক্ষে সকল বিষয় শিক্ষা করা সম্ভবপর না-ও হতে পারে। আমি মনে করি—সকল নীতিশাস্ত্র সংক্ষেপে রাজকুমারদের শিখান হোক।'

সভার সকলে বৃদ্ধ মন্ত্রীর যুক্তিপূর্ণ কথা সমর্থন করলেন। তখন সেই বিচক্ষণ বৃদ্ধ মন্ত্রী আরও বললেন, 'মহারাজ, আমি শুনেছি, বিষ্ণুশর্মা নামে এক পণ্ডিত আছেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁর নাম ভূ-ভারতে খ্যাত। তাঁকে আনতে দূত পাঠান হোক—তাঁরই হাতে রাজকুমারদের শিক্ষার ভার দিন।'

কিছুদিন পরের কথা।

আশি বছরের এক বৃদ্ধ, ঋজুদেহ, শান্ত, সৌম্য, উপবীতধারী

ব্রাহ্মণ এসে মহারাজকে আশীর্বাদ করে দাঁড়ালেন। পরিচয় পেয়ে রাজা অমরশক্তি বললেন, 'মনীষী বিষ্ণুশর্মা, অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন।'

বিষ্ণুশর্মা আসন গ্রহণ করলে রাজা বললেন, 'আপনার জ্ঞান আর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছে, ভূ-ভারতে আপনাকে কে না জানে! আজ আমি আপনাকে একটি অনুরোধ করব। আপনি অনুগ্রহ করে আমার তিনটি মূর্খ পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। বিনিময়ে আপনাকে আমি একশত গ্রাম দান করতে প্রস্তুত আছি।'

শান্তকণ্ঠে বিষ্ণুশর্মা বললেন, 'মহারাজ, আমি জ্ঞান বিক্রয় করি না। আমার বয়সের কথা চিন্তা করুন; এ-বয়সে গ্রাম নিয়ে কী করব? তবু আপনার অনুরোধে আপনার পুত্র তিনটির শিক্ষার ভার গ্রহণ করলাম।'

বিষ্ণুশর্মার কথা শুনে খুশী হয়ে রাজা বললেন, 'বিষ্ণুশর্মা সত্যিই মহান্!'

বিষ্ণুশর্মা বললেন, 'মহারাজ, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি ছ'মাসের মধ্যে আপনার পুত্রদের সকল নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত করে তুলতে না পারি, তবে যেন আমার নরকবাস হয়।'

বিষ্ণুশর্মার এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনে সকলে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন।

মহামতি বিষ্ণুশর্মা তখন মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকোলূকীয়, লব্ধপ্রণাশ ও অপরীক্ষিতকারক—এই পাঁচটি তন্ত্র রচনা করে ছ'মাসের মধ্যে রাজকুমারদের শিক্ষিত করে তুললেন।

বিষ্ণুশর্মার কঠিন প্রতিজ্ঞা সফল হল।
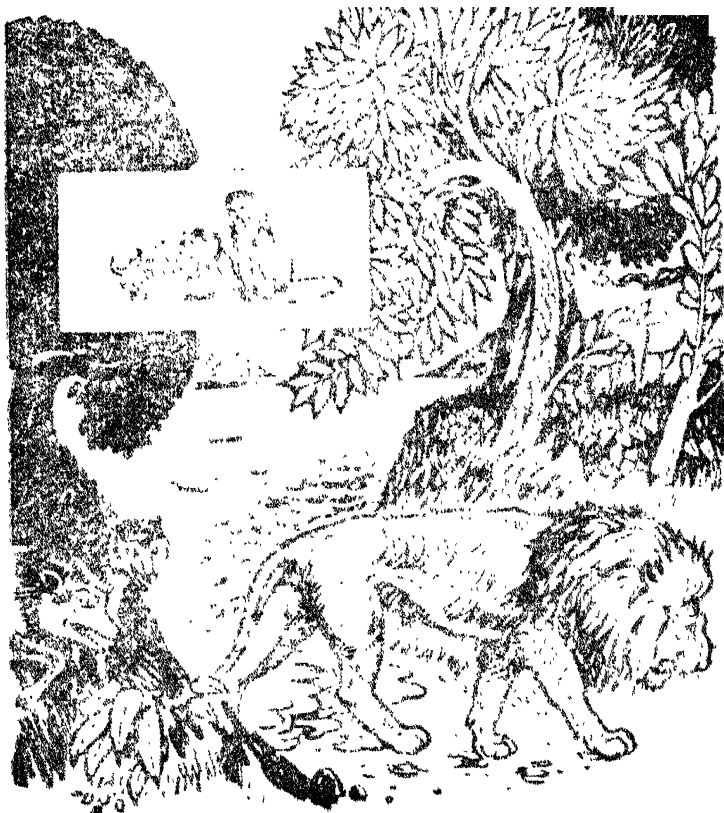
পঞ্চতন্ত্রঃ প্রথম তন্ত্রঃ মিত্রভেদ

বর্ধমানক নামে এক বণিক বাণিজ্য করে দেশে দেশে ফিরতেন। দু'টি হৃষ্টপুষ্ট বলদ তাঁর গাড়ি টানত। বলদ দু'টিকে বর্ধমানক খুব যত্ন করতেন, ভালোও বাসতেন খুব।

একবার বলদের গাড়িতে চড়ে পণ্যদ্রব্য নিয়ে বর্ধমানক মহিলা-রোপ্য থেকে মথুরায় যাচ্ছিলেন। দিনের পর দিন তাঁরা কেবল চলতেই লাগলেন, পথ যেন আর শেষ হয় না। এমন সময় একদিন, যমুনার তীরে কর্দমাক্ত পথে চলতে গিয়ে একটা বলদ পা মচ্‌কে পড়ে গেল। কিছুতেই তাকে উঠান গেল না।

বর্ধমানক তাঁর প্রিয় বলদটার জন্য তিনদিন তিনরাত সেখানে অপেক্ষা করলেন। সঙ্গের লোকেরা তাঁকে বলল যে, একটা বলদের জন্য এত সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বর্ধমানকও ভাবলেন, তাই তো, সামান্য একটা বলদের জন্য বাণিজ্যের ক্ষতি করা ঠিক নয়। তবু তিনি বলদটাকে দেখাশুনা করার জন্য সেখানে ক'জন লোক রেখে গেলেন।

বর্ধমানক চলে যেতে না যেতেই বলদের রক্ষকরা চিন্তা করল, একটা বলদের জন্য এই নির্জন যমুনার তীরে বসে থাকা কোন কাজের কথা নয়। তা ছাড়া, এই বন-প্রদেশে হিংস্র জন্তু যে নেই, তাই-বা কে জানে? তাই সেখানে অপেক্ষা করা নিরাপদ নয় মনে করে তারা বলদটাকে ফেলে চলে গেল। হতভাগ্য বলদটা সেইখানে একা পড়ে রইল।

আরও পাঁচ-সাতদিন কেটে গেল। যমুনাতীরের নির্মল বায়ুতে আর পুষ্টিকর কাঁচ ঘাসের গুণে বলদটা উঠে দাঁড়াল এবং খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল। ক্রমে বলদটা সুস্থ হয়ে উঠল। তার মচ্‌কানো পা ঠিক হয়ে গেল, ব্যথা-বেদনা কিছুই রইল না। অধিকন্তু, খেয়ে খেয়ে সে বেশ মোটাসোটা গোলগাল হয়ে উঠল।

ঘাসের লোভে আর দেশে ফেরবার পথ না জানা থাকায় বলদটা সেখানেই রয়ে গেল। দিনের বেলায় সে যমুনার তীরে তীরে ঘাস খেয়ে বেড়ায়, আর মাঝে মাঝে গভীর গর্জন করে ওঠে। তার সেই গর্জন পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে সমস্ত বনটাকেই যেন

কাঁপিয়ে তোলে। রাত হলে সে পাহাড়ের কোলে কোন এক গাছের তলায় শুয়ে ঘুমোয়। এইভাবে তার দিন কাটে।

পিঙ্গলক নামে এক ভয়ংকর সিংহ ছিল সেই বনের রাজা। পাত্র-মিত্র, মন্ত্রী আর অনুচর নিয়ে রাজা পিঙ্গলক শিকারে বেরিয়েছিল। শিকারের চেষ্টায় ঘুরতে ঘুরতে পিঙ্গলকের বড় তেষ্টা পেয়ে গেল। যমুনার মিষ্টি জল পান করে তেষ্টা মেটাবার জন্যে যেমনি সে নেমে এল যমুনার জলে, অমনি দূরে সেই বলদটা গভীর গর্জন করে উঠল।

গর্জন শুনে পশুরাজ পিঙ্গলক বড় ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবল, এ কোন ভয়ংকর প্রাণীর গর্জন হবে—এ নিশ্চয় আমার চেয়েও বলবান। কী জানি, যদি জলপানের সুযোগে আমায় আক্রমণ করে—এই ভয়ে জলপান না করেই পিঙ্গলক চলে এল। রাজাকে ভীত দেখে তার অনুচররাও কম ভীত হয় নি।

এদিকে কিছুদূরে গাছের আড়ালে বসে ছিল দুই শিয়াল-বন্ধু—করটক আর দমনক। এরা ছিল পশুরাজ সিংহের মন্ত্রী-পুত্র। কিন্তু কোন কারণে এরা অধিকারচ্যুত হয়ে মনের দুঃখে ফিরত। পিঙ্গলক এদের দু'চোখে দেখতে পারত না।

দুই শিয়াল-বন্ধুর মধ্যে দমনক ছিল বেশি চতুর। সে বলল, 'বন্ধু করটক, এই সুযোগে ভীরু রাজার মন্ত্রিত্ব আবার পেতে পারি।'

করটক॥ কেমন করে শুনি? পশুরাজ পিঙ্গলক তো আমাদের দু'চোখে দেখতে পারেন না!

দমনক॥ এবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। রাজা ভীত হয়েছেন, মন্ত্রীরা আরও বেশি। এখন আমি যদি রাজার ভয়ের কারণ দূর করতে পারি, তবে মন্ত্রিত্ব তো হাতের মুঠোয়।

করটক॥ দেখো বন্ধু, অ-ব্যাপারকে ব্যাপার করতে যেয়ো না।

ওতে বিপদ আছে। বেশি চালাকি করতে গিয়ে সেই চপল বানরের অবস্থা না হয়।

দমনক জিজ্ঞাসা করল, 'সে আবার কি?'

তখন করটক 'অতি-চালাকের গলায় দড়ি' গল্পটি বলল।
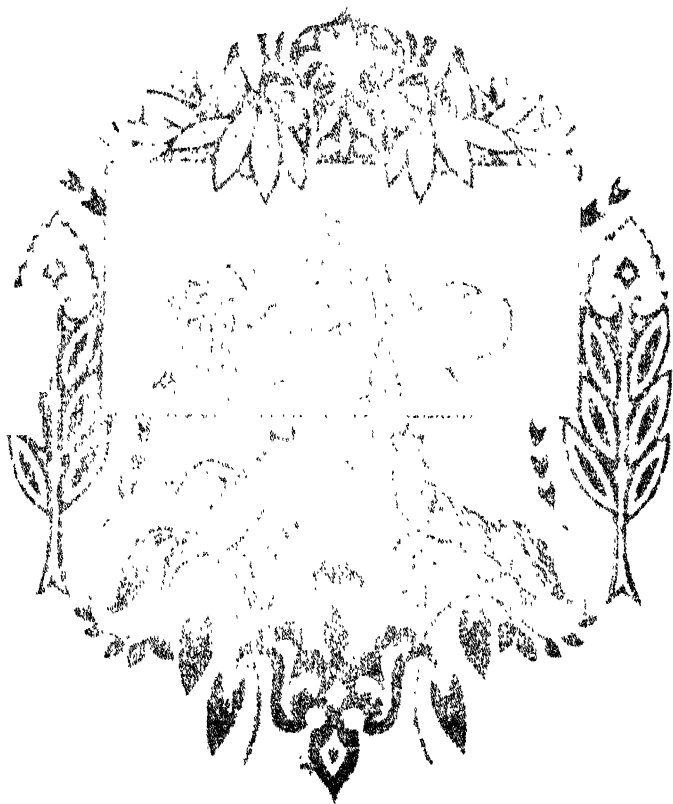
অতি-চালাকের গলায় দড়ি

কোন ধনবান ব্যক্তির প্রকাণ্ড এক বাগান ছিল। নানা ধরনের বড় বড় গাছপালা ছিল সেই বাগানের শোভা।

একবার সেই ধনবান ব্যক্তির ইচ্ছা হল বাগানটাকে কেটে সেখানে

সুন্দর এক মন্দির তৈরি করাবেন। তাঁর আদেশে লোকজন লেগে গেল বাগানের গাছ কাটতে।

কেউ কাঠ চিরছে, কেউ মাটি খুঁড়ে মন্দিরের ভিত তৈরি করছে, কেউ ইঁট গাঁথছে। দিনের পর দিন এইভাবে কাজ চলছে। সকাল থেকে কাজ আরম্ভ হয়, সন্ধ্যায় যে যার কাজ রেখে ঘরে যায়। সারাটা দিন সেই বাগান যেমন লোকের কোলাহলে মুখর হয়ে থাকে, বিকালে লোকজন চলে গেলে তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে।

এমনি এক অপরাহ্নে লোকজনেরা কাজকর্ম রেখে সেদিনের মত ঘরে চলে গেল। এমন সময় কোথা থেকে একদল বানর এসে সেই বাগানটা দখল করে বসল। সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাগানটা আর নিস্তব্ধ রইল না—বানরদের হুটোপুটিতে আর চেঁচামেচিতে তোলপাড় হতে লাগল।

বানরদের স্বভাব বড় চঞ্চল। তারা যা পায়, তা-ই ভাঙে, টানে, উপড়ে দেখে। দিনমান ধরে মজুরেরা যে কাজ করে রেখে গেছে, বানররা কয়েক মুহূর্তে তা লণ্ডভণ্ড করে দিল, এমন কোন জিনিস রইল না, যা তাদের নজরে পড়ে নি, যাতে তারা হাত দেয় নি। এমন কোন অপকর্ম ছিল না, যা তারা করে নি।

এই চঞ্চল বানরদলের মধ্যে একটি ছিল অধিক চঞ্চল। বুদ্ধির অহংকার ছিল তার খুব—সে নিজেকে বেশি চালাক মনে করত। সে চেয়ে দেখল, মস্ত একটা কাঠের গুঁড়ি অর্ধেক-চেরা হয়ে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। এক লাফে সে গিয়ে সেই পরম লোভনীয় আসনটায় চড়ে বসল। কাঠের চেরা ফাঁকটার মধ্যে দিয়ে সে তার লেজটা ঝুলিয়ে দিল। অন্য বানরদের ডেকে বলল সে, 'দ্যাখ, দ্যাখ, আমি রাজা হয়েছি। কেমন আমার সিংহাসন!'

অন্যান্য বানর সেই লোভনীয় আসনটা দেখে লুব্ধ হয়েছিল

নিশ্চয়। কিন্তু সদ্য-সিংহাসন-লাভকারী সেই বানরটির অপরের দিকে তাকাবার অবসর কোথায়? সে দেখল, তার সামনে তার সিংহাসনে একটি গোঁজ দেওয়া রয়েছে! দুর্বুদ্ধি সেই বানর ভাবল, রাজার সিংহাসনে আবার গোঁজ থাকবে কেন? গোঁজটাকে আমি তুলে ফেলি।

এই ভেবে টানতে টানতে সে যেমনি গোঁজটাকে উপড়ে ফেলল, অমনি চেরা কাঠের ফাঁকটা জোরে বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অতি চালাক বানরটির লেজ শক্তভাবে আটকে গেল। সে চিৎকার করে উঠল। তার পর সারারাত ধরে লেজ টানাটানি করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে সেই অতি বুদ্ধিমান বানরটি মারা গেল।

গল্প শেষ করে করটক বলল, 'বন্ধু দমনক, যে অনধিকারচর্চা করে বা বেশি চালাকি করতে যায়, তার এমনি বিপদ হয়।'

দমনক বলল, 'বন্ধু, বুদ্ধিতেই কাজ হয়, গায়ের জোরে নয়। রাজা পিঙ্গলক ভয় পেয়েছেন, এই সুযোগে তাঁর প্রিয়পাত্র হব।'

করটক॥ কিন্তু রাজা ভয় পেয়েছেন—এ তুমি কেমন করে বুঝলে?

দমনক॥ পণ্ডিতরা বলেন—আকার, ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা, বাক্য, নেত্র ও মুখের বিকার দ্বারা মনোভাব বুঝতে পারা যায়। রাজার মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে, তিনি ভীত কিনা।

করটক॥ তা না হয় হল। কিন্তু কেমন করে তাঁর বিশ্বাস-ভাজন হবে?

দমনক॥ প্রভুর অভিপ্রায় বুঝে বুদ্ধিমানরা শীঘ্রই তাঁকে বশ করেন। বুদ্ধি একটা কিছু বার করতেই হবে। তুমি দূরে থাক, আমি রাজা পিঙ্গলকের কাছে যাই।

দূর থেকে দমনককে দেখতে পেয়ে পিঙ্গলক বলল, 'কিহে দমনক, ভালো তো? অনেকদিন তোমার দেখা পাই নি।'

দমনক রাজাকে অভিবাদন করে বলল, 'মহারাজের জয় হোক!'

পিঙ্গলক জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর, কী মনে করে?'

দমনক সবিনয়ে বলল, 'মহারাজ, আপনার কাছে আমার একটি গোপনীয় কথা আছে। আপনার অনুচরদের সামনে সে-কথা বলতে চাই না। যদি তাদের একটু সরে যেতে বলেন, ভালো হয়। কেননা, পণ্ডিতরা বলেন, কোনও মন্ত্রণা তিনজনের কানে গেলেই ক্রমে তা জানাজানি হয়ে যায়।'

পশুরাজ পিঙ্গলকের আদেশে অন্যেরা দূরে সরে গেল। দমনক জিজ্ঞাসা করল, 'মহারাজ, ভীত হয়ে বসে বসে কী চিন্তা করছিলেন?'

পিঙ্গলক মনে মনে চিন্তা করল, এ শিয়াল বড় চতুর! আমার মনের ভাব টের পেল কেমন করে? যদি জানতেই পেরেছে, তবে আর গোপন করে কী লাভ? তাই প্রকাশ্যে বলল, 'প্রিয় দমনক, আজ এই বনে এক ভয়ংকর গর্জন শুনলাম। অনুমান করি—কোন শক্তিমান প্রাণী এই বনে এসেছে। অতএব, বন ত্যাগ করে চলে যাব কি না, তা-ই ভাবছিলাম।'

দমনক মাথা নেড়ে বলল, 'মহারাজ, এ-সংকল্প আপনি ত্যাগ করুন। গর্জনটা নিশ্চয় কোনও প্রাণীর, তার পরাক্রম কেমন তা জানা উচিত নয় কি? কথিত আছে, ভয়ে বা হর্ষে বিবেচনার সহিত যে-ব্যক্তি কাজ করে, কোনরূপ হঠকারিতার আশ্রয় করে না, সে কখনও সন্তপ্ত হয় না।'

পিঙ্গলক বলল, 'উপযুক্ত কথাই বলেছ বটে। কিন্তু যার গর্জন শুনে ভয় পেয়েছি, তার পরাক্রমের পরীক্ষা নিতে সাহস হয় না।'

দমনক বলল, 'মহারাজ পিঙ্গলক, আপনার কথা শুনে আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল। গল্পটা এই—গোমায়ু নামে একটা শিয়াল একবার বনের মধ্যে গুড়-গুড় শব্দ শুনে ভীষণ ভয় পেল। সে ভাবল, বন ছেড়ে অন্য বনে চলে যাবে। তারপর তার কী সুবুদ্ধি

হল—সে মনে মনে ঠিক করল, শব্দটা কিসের তা না দেখে যাবে না। এই ভেবে গাছপালার আড়ালে আড়ালে সে এগিয়ে গিয়ে দেখল, একটা জয়ঢাক পড়ে রয়েছে। বাতাসে চালিত হয়ে তারই শব্দ হচ্ছে। গোমায়ু সাহস করে জয়ঢাকের কাছে গেল। জয়ঢাকের চামড়ার ছাউনি দেখে সে হেসে বলল, আমি এরই ভয়ে ক'দিন না খেয়ে রয়েছি! বন ছেড়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছি! যাক, মনে হচ্ছে এ বস্তুটা মেদে পরিপূর্ণ। এই বলে সে চামড়া ছিঁড়ে জয়ঢাকের ভিতরে ঢুকে দেখল, সব ফাঁকা!

গল্প শেষ করে দমনক বলল, 'মহারাজ, এইজন্যই বলছি যে, না বুঝে-সুঝে বন ছেড়ে যাবেন না। আমায় শিয়াল মনে করে অবজ্ঞা করবেন না। আমি সেই ভীষণ জন্তুটার সঙ্গেও আপনার বন্ধুত্ব ঘটিয়ে দিতে পারি।'

পিঙ্গলক বলল, 'তা যদি পার, তবে তোমায় আমি মন্ত্রিত্ব দেব, কিন্তু তোমার কোন ভয় নেই তো?'

দমনক হেসে বলল, 'প্রভুর আদেশ-পালনই ভৃত্যের কাজ, তাতে প্রাণ যায় যাক। আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন, আমি একবার দেখে আসি।'

দমনক তখন সেই গর্জন লক্ষ্য করে চলতে লাগল। যমুনার তীরে সেই কাঁচ ঘাসে ভরা স্থানটির কাছে গিয়ে দূর থেকেই সে দেখতে পেল, একটি মস্ত বলদ সেখানে ঘাস খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে গর্জন করছে। তাই দেখে দমনকের আনন্দ দেখে কে? সে আপন মনে বলল, 'এমন চাল চালব যে, দুজনকেই কাবু করে নিজের মন্ত্রিত্ব পাকা করে নেব।'

এই ভেবে সে ফিরে চলল প্রভু পিঙ্গলকের কাছে।

এদিকে দমনক চলে আসবার পর পিঙ্গলক মনে মনে ভাবল, এই দমনক একবার অধিকারচ্যুত হয়েছিল—কি জানি কার পেটে কী

দুষ্ট বুদ্ধি আছে—আমি একটু আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে থাকি। পশুরাজ পিঙগলক আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইল, এমন সময় দমনক ফিরে এল। দমনককে একলা আসতে দেখে পিঙগলকের সাহস হল। সে এগিয়ে এসে বলল, 'দমনক, আমি তোমার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, বল কী খবর।'

দমনক বলল, 'মহারাজ, প্রলয়ের দেবতা মহাদেবের বাহন এক ভীষণ বলদ এসেছেন। তাঁর সঙ্গে শক্তিতে কেউ পারবে না। তিনি বললেন—স্বয়ং মহাদেব নাকি তাঁকে এই বনে পাঠিয়েছেন।'

ভয়ে পিঙগলকের মুখ শুকিয়ে গেল। সে বলল, 'তা হলে উপায় ?'

দমনক সাহস দিয়ে বলল, 'মহারাজ, আমি তাকে বলেছি—এ বন দেবী চণ্ডিকার বাহন পশুরাজ পিঙগলকের অধীন। অতএব তুমি আমাদের অতিথি, তুমি আমাদের বন্ধু।'

আহ্লাদে গদগদ হয়ে পিঙগলক বলল, 'দমনক, তুমি ঠিক আমার মনের কথাই বলে এসেছ। আজ থেকে তুমি আমার মন্ত্রী। এখন গিয়ে আমাদের সেই বন্ধুকে সসম্মানে নিয়ে এস।'

পিঙগলকের কথায় দমনক আবার গেল সেই বলদটার কাছে। এবার একেবারে বলদটার কাছে গিয়ে দমনক জিজ্ঞাসা করল, 'মহাশয়ের নাম কি ? নিবাস কোথায় ?'

বলদ বলল, 'আমার নাম সঞ্জীবক। নিবাস মহিলারোপ্য নগরে।...মহাশয়ের নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?'

দমনক বলল, 'আমার নাম দমনক। আমি পশুরাজ পিঙগলকের মন্ত্রী।'

সঞ্জীবক নামক সেই বলদ বলল, 'পিঙগলক কে ?'

দমনক উত্তর দিল, 'এই বনে থাকেন, আর এই বনের রাজা পিঙগলকের নাম শোনেন নি ? মশায়, আপনি তৃণভোজী প্রাণী,

আপনার পক্ষে এ-বনে বাস করা নিরাপদ নয়। বিপদ ঘটতে পারে। কারণ, এ-বনে হিংস্র জন্তুর অভাব নেই।'

দমনকের কথা শুনে সঞ্জীবক ভয় পেয়ে গেল। ভয়ে তার পা কাঁপতে লাগল। সে বলল, 'বন্ধু দমনক, আমার বড় ভয় হচ্ছে। তুমি আমায় রক্ষা কর। তুমি যা বলবে, আমি তা-ই করব।'

দমনক মনে মনে খুশী হয়ে বলল, 'যখন আমায় বন্ধু বলে ডেকেছ, তখন একটা উপায় করতেই হবে। চল, আমাদের প্রভু পিঙ্গলকের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব করিয়ে দিই, তা হলে তোমার আর কোন ভয় থাকবে না।'

সঞ্জীবক সহজেই রাজী হয়ে গেল এ-প্রস্তাবে। দমনক বলল, 'বন্ধু সঞ্জীবক, রাজার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব ঘটিয়ে দেব। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, কখনো গর্ব কোরো না। মূর্খেরা বড় হলে বেশি গর্ব করে থাকে। আমি মন্ত্রী, তুমি আমার বন্ধু। দু'জনে মিলে এ রাজ্য ভোগ করব, কেমন?'

সঞ্জীবক বলল, 'তথাস্তু। উপকারী বন্ধুকে কখনও ভুলব না।'

দিন যায়, মাস যায়।

পশুরাজ পিঙ্গলক আর বণিকের পরিত্যক্ত ভারবাহী বলদ সঞ্জীবক সুখে দিন কাটায়। দু'জনের মধ্যে এমন বন্ধুত্ব হল যে, কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারে না। সারাদিন ধরে তারা একসঙ্গে খায়-দায়, ঘুমায়, গল্প করে, একটিবারও ছাড়াছাড়ি হয় না। সঞ্জীবক নগরের কত বিচিত্র গল্প করে, পিঙ্গলক মুগ্ধ হয়ে শোনে। পিঙ্গলক গল্প করে তার বন্য জীবনের কথা। গল্প করেই দু'জনের সময় কাটে। পিঙ্গলকের আর শিকার করবার সময়ই হয় না। তা ছাড়া ধার্মিক সঞ্জীবকের সঙ্গে থেকে পিঙ্গলক পশুহত্যা প্রায় বন্ধ করে দিল।

রাজা শিকার বন্ধ করে দিলে তার অনুচররা খাবে কী? তারা যে না খেতে পেয়ে খিদেয় ছটফট করে মরছে। মন্ত্রীরাও না খেতে পেয়ে কাহিল হয়ে পড়ল। তাদের রাগ পড়ল সঞ্জীবকের ওপর। একদিন দমনক বলল, 'কী বোকামিটাই করেছি! মূর্খ নিরামিষাশী বলদ কী বুঝবে শিকারের মর্ম! আমরা তো না খেতে পেয়ে মারা গেলাম।'

করটক বলল, 'বন্ধু, যা হোক একটা উপায় কর। খিদের জ্বালা আর সহ্য করতে পারি না। সঞ্জীবক যে আজকাল পিঙ্গলককেও নিরামিষাশী করে তুলল দেখছি!'

দমনক বলল, 'এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি, সঞ্জীবক আর পিঙ্গলকের বন্ধুত্ব আমি ভেঙে দেব, নইলে আমার নাম দমনকই নয়।'

করটক নিরাশ হয়ে বলল, 'বন্ধুত্ব ঘটান যত সহজ, ভেঙে দেওয়া তত সহজ নয়। কেননা, সঞ্জীবক পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান, আর আমাদের প্রভু পিঙ্গলক বড় হিংস্র। শেষে আবার কোন বিপদে না পড়।'

দমনক বলল, 'ভয়ের কোন কারণ নেই। বুদ্ধি থাকলে একটা উপায় হবেই। বুদ্ধির জোরে কাকেরাও সাপকে মারতে পেরেছিল।'

করটক জিজ্ঞাসা করল, 'সে কেমন করে?'

তখন দমনক 'বুদ্ধির জয়' গল্পটি বলল।

বুদ্ধির জয়

বনের ধারে প্রকাণ্ড এক বটগাছ। সেই গাছের ডালে একজোড়া কাক বাসা বেঁধে থাকে। আর সেই গাছের তলায় গর্তের মধ্যে থাকে একজোড়া শিয়াল। কাকদের আর শিয়ালদের মধ্যে খুব ভাব। বিপদে-আপদে একে অপরকে প্রাণ দিয়ে সাহায্য করে।

একবার কাকদু'টোর দু'টি বাচ্চা হল। বাচ্চা দু'টিকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। আদর করে নাম রাখল কালোমানিক। বাচ্চা দু'টিকে একা একা বাসায় রেখে কাকেরা গ্রামে যেত খাবারের খোঁজে, ফিরে আসত সন্ধ্যার আগেই।

এমনি একদিন বাচ্চা দু'টোকে বাসায় রেখে কাক দু'টো খাবারের খোঁজে গেল। ফিরে এসে দেখল, বাসা খালি, বাচ্চা দু'টি নেই।

'কোথায় গেল আমার বাচ্চারা?'—মা-কাকটি কেঁদে বলল, 'তারা তো উড়তে শেখে নি আজও!' খুঁজতে খুঁজতে তারা দেখল, তাদের বাসার কাছেই গাছের ডালে রয়েছে একটি বড় গর্ত। সেই গর্তের মধ্যে প্রকাণ্ড এক সাপ শুয়ে আছে। সাপের গর্তে কালোমানিকদের নরম পালকগুলো পড়ে রয়েছে। তখন বুঝতে বাকি রইল না যে, এই সাপটিই কচি বাচ্চা দু'টোকে খেয়ে ফেলেছে!

কাঁদতে কাঁদতে কাক আর কাকী গেল তাদের শিয়াল-বন্ধুর কাছে।

—'শিয়াল-বন্ধু, শিয়াল-বন্ধু, ঘরে আছ?'

—'কী হল ভাই কাক?' শিয়াল তার গর্ত থেকে বেরিয়ে এল।

—'সাপে আমাদের বাচ্চাগুলোকে খেয়ে ফেলেছে। এবার আমাদের খাবে। কেননা, শাস্ত্রে আছে, যার নদীর তীরে ঘর, আর সাপের সঙ্গে একঘরে বাস, তার মৃত্যু অবধারিত। সাপের সঙ্গে তো গায়ের জোরে পারব না আমরা!'

সব কথা শুনে শিয়াল বলল, 'বন্ধু কাক, কেন মিথ্যে ভয় পাচ্ছ? বুদ্ধি থাকলে সাপকে মারতে কতক্ষণ? কাঁকড়াও বককে মারতে পেরেছিল, তা জান?'

কাক দুটো বলল, 'কেমন করে শুনি?'

তখন শিয়াল 'অতিলোভের ফল' গল্পটি বলতে লাগল।
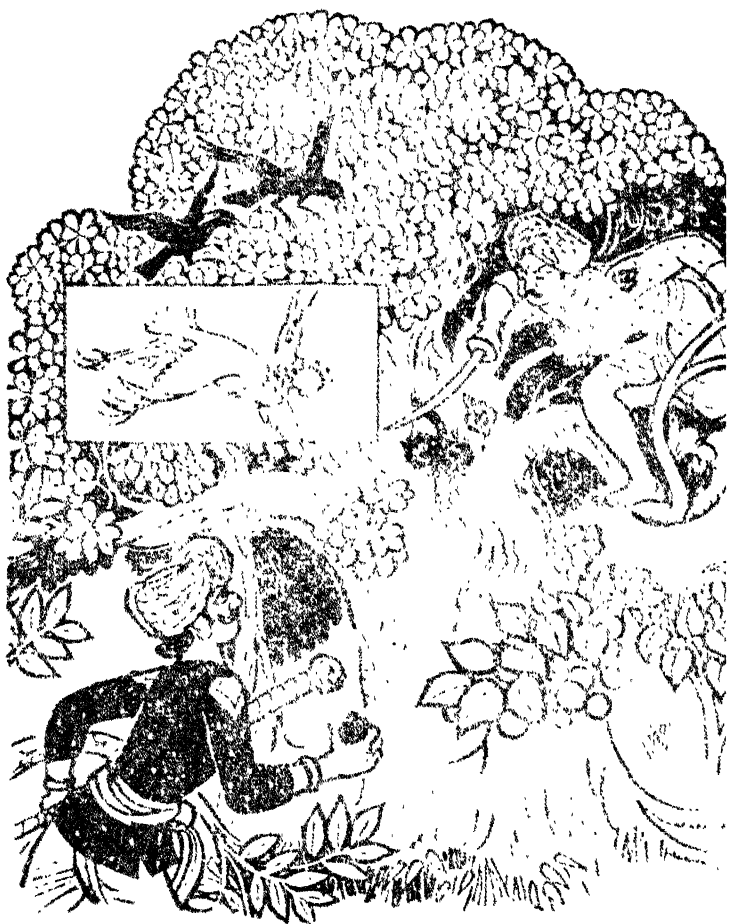
অতিলোভের ফল

পাহাড়ের উপর মস্ত এক বন। বনের মধ্যে ছিল এক জলাশয়। বর্ষার দিনে সারা পাহাড়ের জল এসে জলাশয়টায় পড়ত, আর তার জল কানায় কানায় থৈ-থৈ করত। এত গভীর ছিল এই জলাশয়ের

জল যে, দু'-এক বছর অনাবৃষ্টি হলেও তার জল শুকিয়ে যেত না। তাই সে-জলাশয়ে যত রাজ্যের মাছ, কাঁকড়া আর ব্যাঙ সুখে বাস করত।

বনের সেই জলাশয়টার তীরে তীরে ঝোপে-ঝাপে বাসা বেঁধে থাকত অনেকগুলো বক। হাঁটু-জলে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকত বকেরা। ক্বচিৎ কোন মাছ ভেসে উঠলে ধরে খেত তারা। মাছ না পেলে ব্যাঙ, কাঁকড়া খেয়েই তাদের দিন কাটাতে হত।

একবার একটা বক বুড়ো হয়ে পড়েছিল। মাছ ধরে খাবার মত শক্তি তার আর ছিল না। কিন্তু না খেয়ে তো আর বাঁচা যায় না! তাই সে মনে মনে এক ফন্দি আঁটল। দূর থেকে একটা কাঁকড়াকে আসতে দেখে সে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। অঝোরে তার চোখের জল ঝরতে লাগল। চোখের জলে মাটি ভিজে গেল।

বককে কাঁদতে দেখে কাঁকড়ার বড় কৌতূহল হল, দুঃখও হল খুব। সে বলল, 'বক-মামা, কাঁদছ কেন? খেতে পাও নি নাকি?'

বক বলল, 'ভাগ্নে কাঁকড়া, আমি মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।'

কাঁকড়া॥ মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ! বেশ, ভালো কথা। কিন্তু কাঁদছ কেন?

বক॥ কাঁদছি দুঃখে!

কাঁকড়া॥ তোমার আবার দুঃখ কিসের?

বক॥ নিজের দুঃখে কাঁদছি না ভাগ্নে, পরের দুঃখে কাঁদছি। দেখ, আমি এই জলাশয়ের ধারে জন্মেছি—এখানেই বুড়ো হয়েছি। ক'দিনই-বা আর বাঁচব!

কাঁকড়া॥ ও, এই ভেবে কাঁদছ?

বক॥ না হে না; একটা বড় দুঃসংবাদ শুনেছি, তাই কাঁদছি। আমি আর ক'দিন বাঁচব?—কাঁদছি মাছগুলোর দুঃখে।... এইমাত্র শুনে এলাম, পণ্ডিতরা বলছেন, আগামী বারো বছর

অনাবৃষ্টি হবে। সেই অনাবৃষ্টির দরুন আমাদের এই জলাশয়টার জল শুকিয়ে মাটি ফুটিফাটা হয়ে যাবে। মাছগুলো আর একটাও বেঁচে থাকবে না।

বকের মুখে এই দুঃসংবাদ শুনে কাঁকড়ার মুখ শুকিয়ে গেল। সে বলল, 'মামা, আমার অবস্থাও যে মাছদের মতই হবে!'

এই বলে সে গেল মাছদের খবর দিতে।

বক মনে মনে খুশী হয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

কাঁকড়ার মুখে দুঃসংবাদ শুনে মাছদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। যে যেখানে ছিল, সব একত্র জড়ো হয়ে 'হায় হায়' করতে লাগল। তার পর পরামর্শ করে তারা সেই বকের কাছে এল।

মাছেরা এসে বলল, 'বক-মামা, এ-বিপদে তুমিই আমাদের রক্ষা কর। কী করলে ভাল হয়, তা-ই বল। আমাদের বাঁচাও।'

বক বলল, 'তোমাদের জন্য আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি। তোমরা রাজী থাক তো পাহাড়ের ওপারের বড় জলাশয়টাতে আমি তোমাদের নিয়ে যেতে পারি। বিশ বছরেও ওর জল শুকোবে না।'

—'আমরা রাজী, আমরা রাজী...'

মাছেরা সব হৈ-চৈ লাগিয়ে দিল। বক বলল, 'তোমরা এক এক করে পর পর এস। আমি তোমাদের পার করে দিচ্ছি।'

সেইদিন থেকে বুড়ো ধূর্ত বক মাছদের পার করতে লাগল। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সেই বক পারাপারের কাজে ব্যস্ত থাকে। এইভাবে দিন যায়, মাস যায়, মাছের ভিড় আর ফুরোয় না।

একদিন ভিড় ঠেলে এল কাঁকড়া। অনুযোগের সুরে সে বলল, 'মামা, এ তোমার কেমন বিচার? আমার সঙ্গেই তোমার প্রথম দেখা হয়েছিল, আমিই গিয়ে মাছদের খবর দিয়েছিলাম, কিন্তু আমায় পার করবার সময়ই হয় না তোমার!'

বক বলল, 'আমারই ভুল হয়েছে, আজ তোমায় পার করব। ভাগ্নে, আমার পিঠে এসে বস।'

কাঁকড়াকে নিয়ে বক উড়ে চলেছে। কিন্তু পথ তো আর শেষ হয় না! কাঁকড়ার মনে নানা সন্দেহ আর দুশ্চিন্তা দেখা দিল। এমন সময় সে দেখতে পেল, একখণ্ড বড় পাথরের উপর অসংখ্য মাছের কাঁটা পড়ে আছে। ভয়ে ভয়ে কাঁকড়া জিজ্ঞাসা করল, 'মামা, বড় জলাশয়টা কোথায়?'

বক বলল, 'জলাশয়টা তোমার মামার পেটে! তার জল কোনদিন শুকোবে না—সুখেই থাকবে সেখানে। মাছ খেয়ে খেয়ে আর ভালো লাগছে না। তোমায় খেয়ে আজ মুখের সোয়াদ বদলাব।'

মামার কথা শুনে কাঁকড়া বেচারার তো ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। তবু সে সাহস হারাল না। সে মনে মনে ভাবল, শেষ চেষ্টা একবার করে দেখি। এই ভেবে সে তার ধারালো দাঁড়া দুটো দিয়ে এমন জোরে বকের লম্বা গলাটা চেপে ধরল যে, দম বন্ধ হয়ে বক মরে গেল।

বকের গল্পটা শেষ করে শিয়াল বলল, 'বন্ধু কাক, সাপটাকে এই বকের মত জব্দ করবই। রাতটা ভালোয় ভালোয় কাটুক, কাল সকালে আমার কাছে এস। একটা পরামর্শ দেব।'

পরদিন সকালবেলা শিয়াল কাকদের একটা উপায় বলে দিল। পরামর্শ-মত কাকেরা উড়ে গেল রাজবাড়ির দিকে। রাজবাড়ির এক পাঁচিলের উপর তারা অনেকক্ষণ ধরে বসে রইল।

রাজবাড়িতে রয়েছে মস্ত এক দীঘি। সেই দীঘির বাঁধানো ঘাটে রাজকন্যা এল স্নান করতে। স্নানের আগে রাজকন্যা তার গলার হারছড়া আর মোতির মালা খুলে রাখল বাঁধানো ঘাটে।

কাক দু'টো অবসর বুঝে সেই সুযোগে ছোঁ মেরে হার আর

মোতির মালা নিয়ে উড়ে গেল। রাজবাড়ির দাস-দাসীরা চিৎকার করে উঠল, 'নিয়ে গেল, নিয়ে গেল।'

চিৎকার শুনে রাজবাড়ির পাহারাদাররা ছুটে এল। তারা দেখল, দু'টো কাক রাজকন্যার গলার হার আর মোতির মালা নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। পাহারাদাররা ছুটল কাকের পিছনে পিছনে।

উড়ে উড়ে কাক দু'টো এল তাদের বটগাছটাতে। পিছনে হৈ হৈ করতে করতে পাহারাদাররাও ছুটল। কাক দু'টো সুযোগ বুঝে টুপ করে হার আর মোতির মালা সাপের গর্তে ফেলে দিল।

পাহারাদাররা তখন সেই বটগাছে চড়ে যেই গর্তটার কাছে গেল, অমনি সাপটা ফোঁস করে উঠল। সাহসী পাহারাদাররা তলোয়ারের কোপে সাপটাকে দু'খানা করে কেটে ফেলল, তারপর রাজকন্যার গলার হার আর মোতির মালা নিয়ে হাসতে হাসতে রাজবাড়িতে ফিরে এল।

এদিকে সাপকে জব্দ হতে দেখে কাক দু'টো শিয়াল-বন্ধুর কাছে গিয়ে বলল, 'ভাগ্যে তোমার মত বুদ্ধিমান বন্ধু আমাদের ছিল।'

গল্প শেষ করে দমনক বলল, 'বন্ধু করটক, বুদ্ধিমানরা কোন কাজেই ভয় পায় না। সঞ্জীবক আর পিঙ্গলকের মধ্যে বিভেদ ঘটান আমার কাছে মোটেই শক্ত নয়। সিংহ যতই বলশালী হোক, একবার একটি খরগোশও তাকে বিনাশ করেছিল।'

অবাক হয়ে করটক বলল, 'সে আবার কেমন করে?'

দমনক॥ তবে 'সাবাস খরগোশ'-এর গল্পটি বলি, শোন।
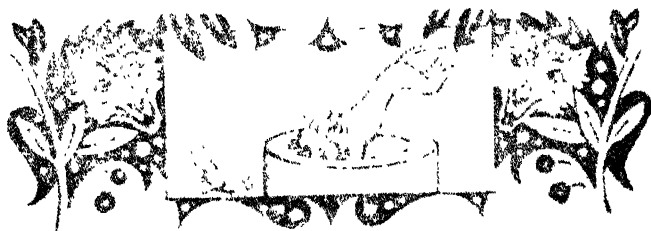
সাবাস খরগোশ

মস্ত এক বন।

সেই বনে একদিন পশুদের এক বিরাট সভা বসেছে। হাতী, ঘোড়া, মহিষ, হরিণ থেকে আরম্ভ করে ছোট্ট খরগোশরা পর্যন্ত

উপস্থিত সেই সভায়। কিন্তু কারো মুখে কোন কথা নেই। সকলের মুখে দারুণ ভয়ের ছাপ।

অনেকক্ষণ পরে সভাপতি বারোশিঙ্গা হরিণ বললঃ

'বন্ধুগণ, এই মহতী সভায় সভাপতিত্ব করার যে সম্মান আপনারা আমায় দিয়েছেন, তাতে আমি সত্যি গৌরব বোধ করছি। কিন্তু আজ আমরা যে বিপদে পড়ে এই সভা আহ্বান করেছি, তা এক চরম বিপদ। আমাদের রাজা ভাসুরক নামক সিংহ যেভাবে অবিরাম পশুবধ করে চলেছেন, তাতে আশঙ্কা হয়, শীঘ্রই আমাদের চৌদ্দ-পুরুষের বাসভূমি এই বনে একটিও পশু বেঁচে থাকবে না। আপনারা চিন্তা করে কোন একটা উপায় বার করুন। আজ এই সভায় আমরা স্থির করব, কেমন করে এই বিপদ থেকে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি।'

সভাপতির ভাষণের পর অনেক বক্তা অনেক যুক্তি-পরামর্শ দিল, অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলল। তার পর সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হল—পশুরাজ সিংহের কাছে এই খবর পাঠান হোক যে, প্রজারা বেঁচে থাকলেই রাজার রাজত্ব। প্রজা না থাকলে আর রাজা কিসের? রাজত্ব কিসের? বরং আমরা পালা করে রাজাকে এক-একটি করে পশু পাঠাব তাঁর খাবার জন্যে। তাতেই তিনি যেন সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁকে আমরা অনুরোধ করব, তিনি যেন অকারণ আমাদের হত্যা না করেন।

পশুদের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব নিয়ে সিংহের কাছে দূত গেল। যথাসময়ে ফিরে এসে দূত খবর দিল যে, পশুরাজ ভাসুরক রাজী হয়েছেন। রোজ সকালে একটি করে পশু তাঁর কাছে পাঠাতে হবে।

বনের পশুরা অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে সভাভঙ্গ করে ঘরে ফিরে গেল। কার কবে পালা আসে, সেই ভয়ে সকলে দিন কাটাতে লাগল।

সেই থেকে রোজ একটি করে পশুকে সিংহের গুহায় পাঠান

হয়। সিংহ গুহায় বসে বিনা পরিশ্রমে তাকে মেরে খায়। এমনি করে দিন যায়। মাস যায়। ক্রমে বছর ঘুরে এল।

অবশেষে একদিন এক বুড়ো খরগোশের পালা এল। বুড়ো খরগোশ আত্মীয়দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিংহের গুহার দিকে চলল।

খরগোশ ভাবছে আর চলছে, চলছে আর ভাবছে, সিংহ যখন আমায় ধরে খাবেই, তখন আর তাড়াতাড়ি গিয়ে তার মন যুগিয়ে লাভ কি? ভেবে দেখি, অত্যাচারী সিংহটাকে কোনরকমে জব্দ করা যায় কিনা। ভাবতে ভাবতে খরগোশটা কখন এসে গেল একটা কুয়োর ধারে। আর একটু হলেই সে পড়ে যেত কুয়োর মধ্যে। হঠাৎ তার নজর পড়ল কুয়োর ভেতরে। সে দেখল, কুয়োর জলে তার সুন্দর ছায়া পড়েছে। তাই দেখে কী একটা মতলব তার মনে পড়ে গেল। সে ছুটতে ছুটতে চলল সিংহের গুহার দিকে।

খরগোশকে দেখে সিংহের বড় রাগ হল। একরত্তি এক খরগোশ, তাকে খেয়ে কি পেট ভরে? তা-ও ইনি এলেন দুপুর করে। সিংহ রেগে গিয়ে বলল, 'বলি ওরে খরগোশ, তোর আক্কেলটা কি?'

খরগোশ॥ (ভয়ের ভান করে) মহারাজ, মাপ করবেন...

সিংহ॥ মাপ-টাপ বুঝি না। এত দেরি কেন হল বল্?

খরগোশ॥ আজ্ঞে সেই কথাটাই বলছি, মহারাজ! আমায় খাবে বলে আর একটা সিংহ আমায় ধরে রেখেছিল।

সিংহ॥ কী, আমার খাবার অন্যে খাবে! কে সেই দুর্বৃত্ত?

খরগোশ॥ প্রভু, আমি শপথ করে বলতে পারি, সে দেখতে ঠিক আপনার মত। ঝরনার ধারে বটগাছটার কাছে তার আস্তানা। সে বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস?' আমি বললুম—'কেন, আজ যে আমার পালা, আমি মহারাজ ভাসুরকের কাছে যাচ্ছি।' সে কি বলল জানেন,

মহারাজ ? সে বলল, 'ভাসুরক মরে গেছে। আজ থেকে আমিই তোদের রাজা। আমারই কাছে পালা করে আসবি এখন থেকে।' সে আমাকে এতক্ষণ আটকে রাখল। আমি মহারাজের সঙ্গে দেখা করেই তার কাছে ফিরে যাব—এই কথা দিয়ে এসেছি।

সিংহ রাগে কেশর ফুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার পর সে এমন জোরে হুংকার দিয়ে উঠল যে, বেচারা খরগোশের কানে তালা লেগে গেল। আস্ফালন করে সিংহ বলল, 'কোথায় সেই দুরাত্মা, একবার দেখিয়ে দে দেখি। আজ তারই একদিন, কি আমারই একদিন।'

খরগোশ আগে আগে পথ দেখিয়ে চলছে আর মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছে। পিছনে ভাসুরক গর্জন করতে করতে যাচ্ছে। একদমে তারা এসে গেল ঝরনার ধারে সেই বটগাছটার কাছে।

খরগোশ সিংহের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মহারাজ দেখেছেন, আপনাকে দেখে সেই দুষ্ট সিংহ ওখানে লুকিয়েছে। মহারাজ সাবধান, আমার কিন্তু বড্ড ভয় হচ্ছে।'

সিংহ বলল, 'আমি কাছে থাকতে তোর কোন ভয় নেই। ও বুঝি গর্তে লুকিয়ে পরিত্রাণ পাবে? ওকে আজ যমের বাড়ি না পাঠিয়ে ছাড়ব না।' এই বলে সিংহ একেবারে কুয়োর কিনারায় এসে আক্রমণের উদ্যোগ করল। কুয়োর পরিষ্কার জলে তারই নিজের ছায়া দেখা গেল। তার মনে হল, কুয়োর ভেতর থেকে অপর সিংহটিও বুঝি আক্রমণের উদ্যোগ করছে। ভীষণ এক হুংকার দিয়ে ভাসুরক অপর সিংহটাকে ধরতে কুয়োর জলে লাফিয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ কুয়োর জলে হাবুডুবু খেয়ে সেই অত্যাচারী ভাসুরক নামে পশুরাজ একেবারে তলিয়ে গেল, আর উঠল না।

বুড়ো খরগোশ আনন্দে নাচতে নাচতে ফিরে এল। পথে যার সঙ্গে দেখা হল, তাকেই খবরটা দিল। তখন সব পশু বলল, 'সাবাস খরগোশ।'

গল্প শেষ করে দমনক বলল, 'বুঝেছ বন্ধু, এইজন্যই পণ্ডিতরা বলেন—যার বুদ্ধি আছে, তার বলও আছে। নির্বোধের আর বল কোথায়?'

করটক বলল, 'যা হোক, তুমি সাবধানে এগিও। বেশি চালাকি করতে যেয়ো না।'

দমনক এখন সুযোগ খুঁজতে লাগল—কেমন করে বিচ্ছেদ ঘটাবে পশুরাজ পিঙ্গলক আর সঞ্জীবকের মধ্যে। কিন্তু সুযোগ আর পায় না। যেখানেই পিঙ্গলক, সেখানেই সঞ্জীবক, আর যেখানেই সঞ্জীবক, সেখানেই পিঙ্গলক। একা কাউকে পাওয়া যায় না। দমনক কিন্তু নিরাশ হয় না। সে ক্ষুধার জ্বালায় যত কাতর হয়, তত নতুন নতুন ফন্দি আঁটে।

এমন সময় একদিন এক অপূর্ব সুযোগ পাওয়া গেল। দমনক দেখল, পশুরাজ পিঙ্গলক একা শুয়ে নিজের গা চাটছে। সে ভাবল, এই তো পরম সুযোগ। আর দেরি কেন? চারদিকে সে চেয়ে দেখল, সঞ্জীবককে দেখা যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে সে এগিয়ে গেল পিঙ্গলকের দিকে।

দমনককে দেখে পিঙ্গলক বলে উঠল, 'আরে মন্ত্রী যে! এস, এস। কী খবর বল।'

দমনক॥ প্রভু, রাজ্যের খবর ভালোই। প্রজারা সুখেই আছে। কিন্তু...

পিঙ্গলক॥ কিন্তু কি?

দমনক॥ প্রভু যদি অভয় দেন তো বলি। শাস্ত্রে আছে যে, মন্ত্রী রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী, তার সকল কথাই রাজাকে বলা উচিত।

পিঙ্গলক॥ মন্ত্রী, তোমার চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ! কোন দুঃসংবাদ থাকলেও তা নির্ভয়ে বল।

দমনক॥ প্রভু, আপনার পরম বন্ধু সঞ্জীবক আপনার উপর

বিরূপ হয়েছেন। তাঁর মতিগতি ভালো নয়। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন!

পিঙ্গলক হেসে বলল, 'এই কথা! সে যদি কিছু বলে থাকে, তবে ঠাট্টা করে বলেছে। দেখ মন্ত্রী, তোমার চেয়ে সঞ্জীবককে আমি ভালো করে চিনি। সে আমার কোন অনিষ্ট করতে পারে না।'

দমনক বলল, 'মহারাজ, যা ভালো বোঝেন, তা-ই করবেন। আমার কর্তব্য আমি করে গেলাম। দেখবেন, অনাত্মীয়কে আত্মীয় করতে গিয়ে চণ্ডরবের দশা না হয়।'

পিঙ্গলক জানতে চাইল চণ্ডরবের কি হয়েছিল। তখন দমনক বলল, 'নীলবর্ণ পশুরাজ'-এর গল্প।
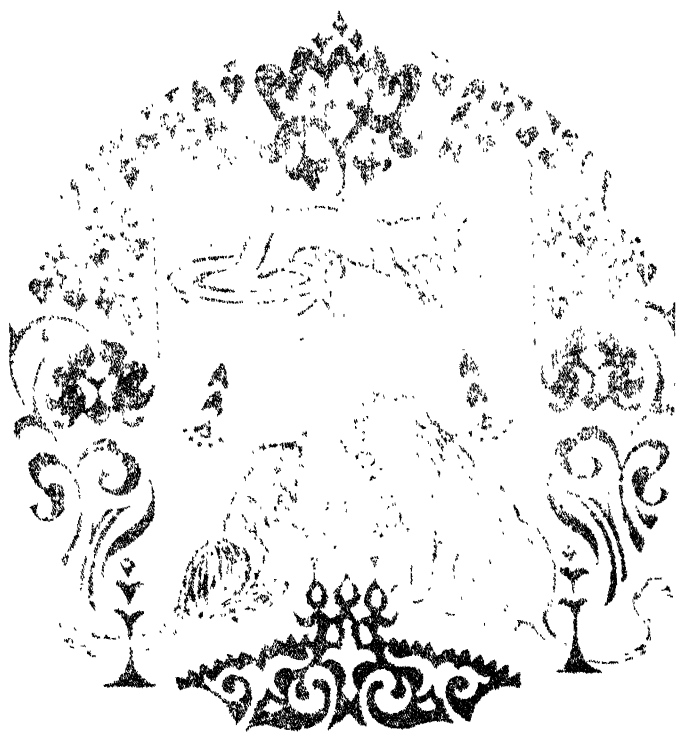
নীলবর্ণ পশুরাজ

এক ছিল শিয়াল।

জঙ্গলের ধারে গর্তের মধ্যে সে থাকত আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে। সেই শিয়াল ছিল বড়ই ধূর্ত। মা-বাপ তার নাম রেখেছিল চণ্ডরব। বোধ হয় প্রচণ্ডই ছিল তার রব।

একদিন কাঁকড়ার লোভে নদীর ধারে ঘুরতে ঘুরতে সে এসে গেল একেবারে গাঁয়ের কাছে। কাঁকড়ার চিন্তায় সে এতই তন্ময় ছিল যে, তার খেয়ালই ছিল না কোথায় সে এসে গেছে। খেয়াল হল তখন, যখন সে দেখল, একপাল কুকুর তার দিকে ছুটে আসছে। বিপদ বুঝে চণ্ডরব লেজ গুটিয়ে ছুটতে লাগল।

চণ্ডরব যত ছোটে, কুকুররাও তত ছুটতে থাকে। কুকুররা চণ্ডরবকে প্রায় ঘিরে ফেলল। তখন নিরুপায় হয়ে চণ্ডরব দৌড়াতে গিয়ে পথ ভুলে এসে গেল গাঁয়ের মধ্যে। কিন্তু গাঁয়ের ভেতরে এসে চণ্ডরবের বিপদ আরও বেড়েই গেল। গাঁয়ের লোকেরা তাকে দেখে তাড়া করে এল।

এই প্রাণান্তকর বিপদে ছুটতে ছুটতে চণ্ডরব এসে গেল এক ধোপাখানায়। ধোপাখানায় ছিল মস্ত একগামলা নীলজল। চণ্ডরব হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সেই গামলায়। ভালোই হল--এ যেন শাপে বর। চণ্ডরব নাকটা মাত্র ভাসিয়ে, গা ডুবিয়ে, বসে রইল সেই নীল জলে। কুকুররা আর তাকে খুঁজে না পেয়ে ঘেউ ঘেউ করতে করতে চলে গেল।

এদিকে নীলজলে বসে থেকে চণ্ডরব কেবল ভাবছে, ধোপারা এসে গেলে তার আর রক্ষা থাকবে না। দেখতে দেখতে দিন গেল, সন্ধ্যা হল। সময় বুঝে চণ্ডরব গামলা থেকে উঠে দে ছুট। ছুট ছুট ছুট। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে চণ্ডরব এসে গেল বনে নিজের আস্তানায়।

শিয়ালের মত দেখতে, কিন্তু গায়ের রঙ ঘোর নীলবর্ণ—এমন জন্তু বনে আর একটিও ছিল না। বনের পশুরা তাই বলাবলি করতে লাগল—এ আবার কোন্ জন্তু! জন্মেও তো এমন জন্তু দেখি নি! না জানি এ কোন ভীষণ জন্তু হবে!

চণ্ডরব লক্ষ্য করল, বনের পশুরা তাকে চণ্ডরব বলে চিনতে

পারছে না। বরং সিংহ, হাতী, গণ্ডার পর্যন্ত তাকে ভয় করে চলছে।

একদিন বনের পশুরা সব দল বেঁধে চণ্ডরবের কাছে এসে জোড়-হাত করে বলল, 'প্রভু, আপনি কে বটেন? কোথা থেকে আপনার আগমন হয়েছে?'

চণ্ডরব গম্ভীরস্বরে বলল, 'আমি স্বর্গ থেকে আসছি। আমার নাম কুকুদ্রুম। স্বয়ং ব্রহ্মা আমায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন— "কুকুদ্রুম, পশুদের মধ্যে রাজা নেই। তুমি গিয়ে তাদের পালন কর।"

সকল পশু বলল, 'মহারাজ কুকুদ্রুম, আমরা আপনার গরীব প্রজা, আমরা আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য।'

চণ্ডরব এখন আর চণ্ডরব নয়। সে এখন নীলবর্ণ পশুরাজ কুকুদ্রুম। কুকুদ্রুম সুখে রাজত্ব করতে লাগল। বাঘ, সিংহ ভালো ভালো শিকার ধরে তাদের রাজা কুকুদ্রুমকে উপহার দেয়। কুকুদ্রুম তা থেকে কিছু খায়, আর প্রজারা প্রসাদ পায়।

একদিন কুকুদ্রুম সভায় বসেছে। বাঘ, সিংহ, হাতী, গণ্ডাররা তার চারদিকে ঘিরে বসেছে। সন্ধ্যা হয় হয়। সভার কাজও প্রায় শেষ হয়ে এল। পশুরা সব উঠি উঠি করছে, এমন সময় দূরে একদল শিয়াল ডেকে উঠল—হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া...

স্বজাতীয়দের আওয়াজ শুনে কুকুদ্রুমের মন আনচান করে উঠল। কোনরকমে ঢোক গিলে সে নিজেকে সামলে নিল।

শিয়ালরা আবার ডাকল—হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া...

কুকুদ্রুম কান খাড়া করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে আর নিজেকে সামলাতে পারছে না। সভাসদ্‌দের মধ্যেও কৌতূহল দেখা গেল। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

শিয়ালরা আবার ডেকে উঠল—হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া...

জাতি, ধর্ম আর স্বভাব গোপন রাখা গেল না। জ্ঞাতিদের ডাক শুনে কুকুদ্রুমও মুখ উঁচু করে ডেকে উঠল—হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া...

—'তবে রে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক শিয়াল!' এই বলে বাঘ, ভালুক, সিংহ আর গণ্ডার মিলে মহারাজ কুকুদ্রুম ওরফে চণ্ডরবকে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

গল্প শেষ করে দমনক বলল, 'মহারাজ, আত্মীয়কে ছেড়ে যে অনাত্মীয়কে আত্মীয় করে, চণ্ডরবের মত তার বিনাশ হয়। আপনার বন্ধু সঞ্জীবক আজ আমায় বলেছেন—ওহে, তোমাদের রাজার সঙ্গে মিশে তার বলাবল আর পরাক্রম বুঝেছি। কাল সকালেই তাকে বধ করব।'

দমনকের চাতুরিতে পিঙ্গলক ভাবল যে, হয়তো দমনকের কথাই ঠিক ; বলা যায় না কার পেটে কি আছে! তবু সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারল না যে, সত্যি সঞ্জীবক তাকে বধ করবার চেষ্টা করবে।

পিঙ্গলককে চিন্তিত দেখে দমনক বলল, 'মহারাজ, আমার কথায় বিশ্বাস করে কাজ কি? আপনি কাল সকালেই দেখবেন যে, সঞ্জীবক আর আগের মত আপনার সঙ্গে ব্যবহার করবে না। লক্ষ্য করবেন, তার চোখ দু'টি জবাফুলের মত লাল, আর সে ঘন ঘন আপনার দিকে চেয়ে আক্রমণের সুযোগ খুঁজছে। মহারাজ, তাকে আক্রমণের সুযোগ না দিয়ে আগেই তাকে আক্রমণ করবেন।'

পিঙ্গলক ভাবল, 'তা কেমন করে হয়? বন্ধু যতই অনিষ্ট করুক, তাকে কি আমি হত্যা করতে পারি? লোকে বলে, বটবৃক্ষ রোপণ করে নিজের হাতে তাকে কাটতে নেই।'

দমনক বলল, 'মহারাজ, কপট বন্ধুর সঙ্গে এরূপ ব্যবহার সাজে না। তাকে বিনাশ না করলে আপনারই বিপদ হবে।'

পিঙ্গলক ভীত ও চিন্তিত হয়ে বলল, 'মন্ত্রী, তোমার কথাই ঠিক! কাল সকালেই তার সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা হবে।'

পিঙ্গলকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দমনক মনে মনে খুশী হয়ে এল সঞ্জীবকের কাছে।

সঞ্জীবক নিজের জায়গায় শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছিল। দমনককে তার দিকে আসতে দেখে সঞ্জীবক আহ্বান করল, 'এস, এস বন্ধু, অনেক দিন পরে দেখা। ভালো আছ তো?'

দমনক বলল, 'ভালোই আছি, বন্ধু। তবে আমাদের থাকা আর না থাকা সমান কথা। গুরুতর রাজকার্যের দায়িত্ব নিয়ে আছি। খাওয়া-দাওয়ারই সময় আর হয়ে ওঠে না।'

সঞ্জীবক॥ সে তো বটেই, রাজকার্য বড় কঠিন।

দমনক॥ শুধু রাজকার্য নয়। সাংসারিক কাজও তো রয়েছে। বন্ধুর প্রতি কর্তব্য—তা-ও তো ভুলতে পারি না। তুমি আমার বিশেষ বন্ধু, তোমার উপকার না করেও পারি না।

সঞ্জীবক॥ তোমার উপকারের কথা ভুলতে পারব না, বন্ধু। তুমিই আমায় রক্ষা করেছিলে।

দমনক॥ (হতাশভাবে) আর বুঝি তোমায় রক্ষা করতে পারলাম না, বন্ধু!

সঞ্জীবক॥ (ভীত হয়ে) কেন, কী হয়েছে, বন্ধু?

দমনক॥ তুমি শোন নি কথাটা?

সঞ্জীবক॥ কোন্ কথাটা?

দমনক॥ (চুপি চুপি) মহারাজ পিঙ্গলক তোমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। বলেছেন, বোকা বলদটাকে ভালো করে জেনে নিলাম। আর এখন বেশ মোটাসোটাও হয়েছে। কাল সকালেই তার ঘাড় মটকাব।

দমনকের কথা শুনে সঞ্জীবকের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। মূর্ছা ভাঙলে সে বলল, 'বন্ধু, এমন যে হবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি! ঋষিরা ঠিকই বলে গেছেন,

সমুদ্রেরও তলের নাগাল পাওয়া যায়, কিন্তু রাজার মনের নাগাল পাওয়া যায় না।'

দমনক বলল, 'বন্ধু, ঋষিরা সত্যি কথাই বলে গেছেন। আমি মহারাজকে বলেছিলাম—মহারাজ, বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। ব্রহ্মহত্যা করেও প্রায়শ্চিত্ত করলে পাপ কাটে; কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত নেই। কিন্তু কে শোনে কার কথা! তাই আমার মনে হয়, এ-বন থেকে তোমার পালিয়ে যাওয়াই উচিত।'

সঞ্জীবক বলল, 'বন্ধু, মরণ যদি কপালে থাকে, তবে পালিয়ে গেলেও মরতেই হবে! সিংহের বন্ধু সেই উটের কী হয়েছিল? বন্ধুত্বের ফল তাকে প্রাণ দিয়ে শোধ করতে হয়েছিল।'

দমনক জিজ্ঞাসা করল, 'ঘটনাটা কি? খুলে বল, শুনি।'

তখন সঞ্জীবক বলতে লাগল 'দুষ্টের ছল'-গল্পটি।
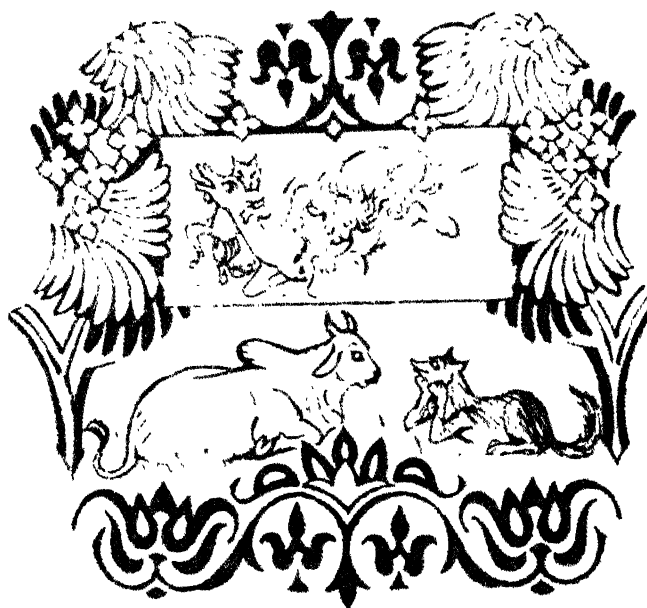
দুষ্টের ছল

মদোৎকট নামে এক সিংহ ছিল।

সে অঞ্চলে মদোৎকটের মত পরাক্রমশালী সিংহ আর ছিল না। বনের পশুরা তার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত। তিনটি সহচর ছিল

মদোৎকটের—একটি নেকড়ে বাঘ, একটি শিয়াল আর একটি কাক। সিংহটি ছিল যেমন ভয়ংকর, তার বন্ধুরা ছিল তেমনি কুটিল।

একবার দলছাড়া নিরীহ একটি উটের দেখা পেল তারা। মদোৎকট বলল, 'বন্ধুগণ, এই নিরীহ উটটি আমাদের অতিথি। আমরা একে গ্রহণ করব। তোমরা রাজী তো?'

বন্ধুরা বলল, 'নিশ্চয় নিশ্চয়! আপনি যা ইচ্ছা করবেন, আমরা তাতেই রাজী।'

তখন সেই সিংহ, নেকড়ে, শিয়াল আর কাক গিয়ে উটকে বন্ধু বলে গ্রহণ করল। এদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে উট বলল, 'আমি আপনাদের বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করব।'

তারপর সকলে মিলে প্রতিজ্ঞা করল, আমরা পাঁচ বন্ধু একসঙ্গে থাকব। একের বিপদে অপরে সাহায্য করব। আমাদের মধ্যে কখনও মনোমালিন্য হবে না।

সেই থেকে পাঁচ বন্ধু সুখে বাস করতে লাগল।

কিছুদিন পরের কথা। একবার একটা পাগলা হাতীর সঙ্গে মদোৎকটের ভীষণ লড়াই হল। কে হারে, কে জেতে বলা শক্ত, এমন সময় পাগলা হাতী দাঁত দিয়ে মদোৎকটের বুকে এমন গুঁতো দিল যে, মদোৎকট বাপ বাপ বলে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে এল। সেই থেকে বুকের ব্যথায় মদোৎকটের বীর দেহে আর নড়াচড়ার শক্তি রইল না।

বুকের ব্যথায় কাতর হয়ে মদোৎকট পড়ে রইল, শিকার করা তার পক্ষে আর সম্ভবপর হয় না। তাই তাকে উপোস করে থাকতে হয়। আবার মদোৎকট শিকার না করলে তার বন্ধু—নেকড়ে, শিয়াল আর কাককেও না খেয়ে থাকতে হয়। এতদিন মদোৎকটের প্রসাদ

খেয়েই ওরা বেঁচে ছিল। কেবল উটের খাদ্যকষ্ট ছিল না ; তবু বন্ধুদের কষ্টে সে-ও মনে দুঃখ পেল।

একদিন উট গেছে ঘাসের সন্ধানে। সেই সুযোগে কাক, শিয়াল, আর নেকড়ে এসে মদোৎকটকে বলল, 'মহারাজ, ক্ষিধের জ্বালায় আমাদের প্রাণ যায়। কিন্তু আপনার কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি না। একে গায়ের বেদনা, তার উপর ক্ষিধের জ্বালা। আমাদের অনুরোধ, তৃণভোজী উটটাকে খেয়ে প্রাণ-রক্ষা করুন।'

মদোৎকট বলল, 'ছি ছি! এমন পাপের কথা মুখে এনো না! উট আমাদের বন্ধু। না খেয়ে প্রাণ গেলেও বন্ধুকে খেয়ে বাঁচবার সাধ আমার নেই।'

কাক, শিয়াল আর নেকড়ে বলল, 'তা হলে আমরা খুঁজে দেখি কোন শিকারের সন্ধান পাওয়া যায় কি না।'

এই বলে তারা শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। কিছুদূর যেতেই কাক বলল, 'ঐ দেখ, উট বেচারা খেয়ে-দেয়ে আরাম করে মদোৎকটের কাছে যাচ্ছে।'

নেকড়ে বলল, 'আমরা না খেতে পেয়ে যত শুকোচ্ছি, ও যেন ততই মোটা হচ্ছে।'

শিয়াল বলল, 'কোন একটা উপায় করে ওকে খাওয়া যায় না কি?'

কাক বলল, 'তোমরা যদি তাই চাও তো আমি একটি উপায় করে দিতে পারি। চল আমার সঙ্গে মদোৎকটের কাছে। আমি যা বলব, তোমরাও তাই বলবে।'

কাক, শিয়াল আর নেকড়ে মদোৎকটের কাছে ফিরে এল।

তারা দেখল, উট-বন্ধু মদোৎকটের পাশেই বসে আছে। কাক বলল, 'মহারাজ, আমরা অনেক চেষ্টা করে কোন শিকারের সন্ধান পেলাম না। তাই আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক হয়েছি। কেননা, এরূপ কথিত আছে যে, যে-কুলে যে-পুরুষ প্রধান, তাকে

সর্বপ্রকারে রক্ষা করতে হয়। অতএব, মহারাজ, আপনি আমায় আহার করে ক্ষুধা দূর করুন।'

কাকের কথা শুনে মদোৎকট বড় সন্তুষ্ট হল। সে হেসে বলল, 'তোমায় খেয়ে তো পেট ভরবে না বন্ধু।'

শিয়াল বলল, 'মহারাজ, তা হলে আমায় খান। আমায় খেলে পেট ভরতে পারে।'

শিয়ালের কথা শেষ হতে না হতে নেকড়ে বলল, 'মহারাজ, খেতে যদি হয়, তবে আমায় খান। আমায় খেয়ে আমার অক্ষয় স্বর্গবাসের সুযোগ করে দিন। কেননা, বন্ধুর জন্য প্রাণত্যাগ করলে স্বর্গবাসই হয়ে থাকে।'

মদোৎকট বলল, 'ছি, ছি, তোমরা স্বজাতি। স্বজাতিকে খেলে যে মহাপাপ হবে!'

তখন উট বলল, 'বন্ধু, আমায় খেয়ে যদি তোমার প্রাণ বাঁচে, তবে আমায় খাও।'

উটের কথা শেষ হতে না হতে সিংহ, নেকড়ে আর শিয়াল একসঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বধ করে পরম সুখে আহার করল।

গল্প শেষ করে সঞ্জীবক বলল, 'বন্ধু দমনক, আমার বিশ্বাস, কোন দুষ্ট ব্যক্তি আমার প্রতি পিঙ্গলককে উত্তেজিত করছে। নইলে এমন হত না। যা হোক, যদি মৃত্যুই কপালে থাকে, তবে তা হবেই। কাজেই পালিয়ে না গিয়ে আমি যুদ্ধ করেই আত্মরক্ষার চেষ্টা করব।'

দমনক ভীত হয়ে ভাবল, এ দেখছি যুদ্ধ করবার জন্যই তৈরী হচ্ছে। কী বিপদেই পড়া গেল! এর শিংগুলো যেমন লম্বা, তেমনি ধারালো। ভয় হয়, মহারাজ পিঙ্গলকের কোন অনিষ্ট না হয়। যা হোক, সে প্রকাশ্যে বলল, 'বন্ধু সঞ্জীবক, বলবান দেখলে পলায়ন

করাই বিধেয়। যে নিজের বল না বুঝে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়, সমুদ্রের মত সে তিতির পাখীর কাছে পরাজিত হয়।'

সঞ্জীবক জিজ্ঞাসা করল, 'তিতির পাখীর ঘটনাটা কি?'

দমনক॥ তবে শোন 'সমুদ্র-শাসন'-এর গল্প। সে এক মস্ত কাহিনী।

সমুদ্র-শাসন

ছোট্ট একজোড়া তিতির পাখী সমুদ্রের তীরে বাস করত। সমুদ্রের কিনারায় বালুকার মধ্যে এক গর্তে ছিল তাদের বাসা।

দিনের বেলা শান্ত সমুদ্রের উপর দিয়ে বহুদূর তারা উড়ে যেত। কখনও সমুদ্রের ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠলে তারা ঢেউয়ের জল ছুঁয়ে

ছুঁয়ে সমুদ্রের সঙ্গে খেলা করত। এইভাবে আনন্দে তাদের দিন কাটত।

কিছুদিন পরের ঘটনা। মেয়ে-তিতিরটা ডেকে বলল পুরুষ-তিতিরটাকে, 'আমার ডিম পাড়বার সময় হয়েছে। তুমি একটা ভাল বাসা খুঁজে দাও।'

পুরুষ-তিতির বলল, 'আমাদের এ-বাসাটা মন্দ কী! অন্য বাসায় কি দরকার?'

মেয়ে-তিতির বলল, 'দেখছ না, আজকাল সমুদ্র কেমন ভীষণ হয়ে উঠেছে। তার ঢেউগুলো তীর ভাসিয়ে অনেক দূর অবধি যাচ্ছে। আমার ভয় হয়, পাছে সমুদ্রের ঢেউ আমার ডিমগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।'

তিতির বলল, 'তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ, গিন্নী। সমুদ্রের কী সাধ্য যে, আমাদের ডিমগুলোকে নিয়ে যায়! আমি বলছি, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ডিম পাড়।'

তিতিরের কথায় ভরসা পেয়ে তিতির-বৌ সমুদ্রের তীরে বালির গর্তে দু'টি ডিম পাড়ল। এদিকে তিতির পাখীর আস্পর্ধার কথা শুনে সমুদ্রের বড় রাগ হল। সে মনে মনে বলল, 'তিতির পাখীর এত দেমাক! আচ্ছা, দেখি সে কি করতে পারে!'

তখন সমুদ্রের গর্জন উঠল বেড়ে, ঢেউগুলি এসে তীরে তীরে ধাক্কা দিল। পাহাড়ের মত বড় একটা ঢেউ এসে তিতির পাখীদের ডিমজোড়া ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

মেয়ে-তিতির সারাদিন ধরে সমুদ্রের উপর কাঁদতে কাঁদতে উড়তে লাগল—ফিরিয়ে দে, ফিরিয়ে দে, ফিরিয়ে দে!

সন্ধ্যায় মেয়ে-তিতির কাঁদতে কাঁদতে এসে পুরুষ-তিতিরকে বলল, 'আমি আগেই বলেছিলাম, তুমি শুনলে না! হায়, পণ্ডিতরা

ঠিকই বলে গেছেন—যে ব্যক্তি হিতৈষী বন্ধুর কথা শোনে না, দুর্বুদ্ধি কুম্বগ্রীবের মত তার পরিণাম হয়। পুরুষ-তিতির জিজ্ঞাসা করল, 'কুম্বগ্রীব কে? তার কি হয়েছিল?'

মেয়ে-তিতির তখন বলতে লাগল, 'বোকামির ফল' গল্প।
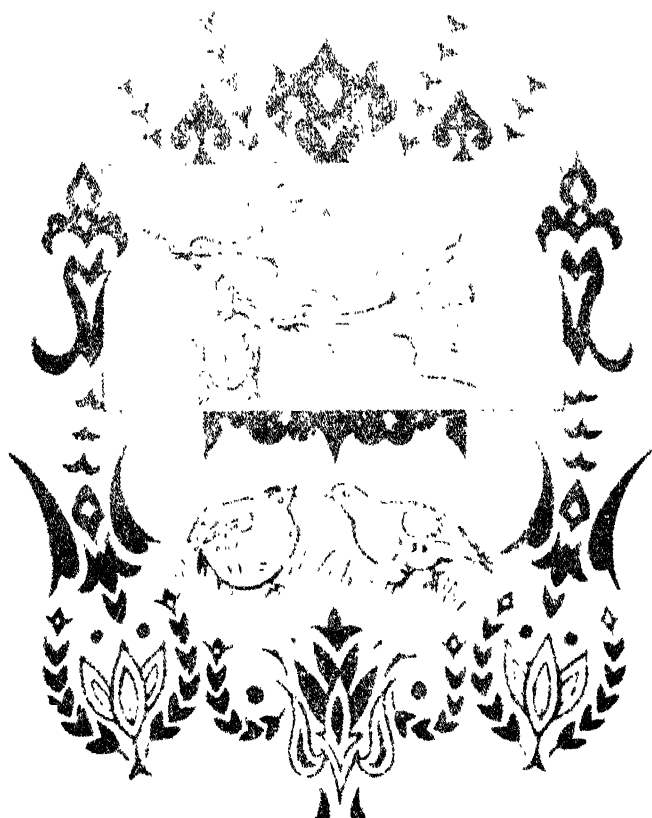
বোকামির ফল

পাহাড়ের কোলে বনের মধ্যে কতকালের একটি ছোট পুকুর। সেই পুকুরের জলে বহুদিনের পুরানো একটি কচ্ছপ বাস করত। তার নাম কম্বুগ্রীব।

পাহাড়ের উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে দু'টি রাজহাঁস দেখতে পেল সেই ছোট্ট পুকুরটিকে। ছোট্ট হলে কি হয়, সেই পুকুরটি ছিল বড় মনোরম, তার জল ছিল শীতল, আর ছিল তাতে পদ্মের বন। এমন চমৎকার পুকুরটির শোভা ভুলতে পারল না হাঁস দু'টো ; তারা রোজ এসে এই পুকুরে সাঁতার কাটত, পদ্মের মৃণাল ভাঙত, গুগ্‌লি খেত।

দেখতে দেখতে কম্বুগ্রীবের সঙ্গে হাঁস দু'টোর বড় ভাব হয়ে গেল। ক্রমে সেই ভাব বন্ধুত্বে পরিণত হল। কম্বুগ্রীবের সঙ্গে হাঁস দু'টো গল্প করে—কত রাজ্যের গল্প, কত সুখ-দুঃখের আলাপ, কত আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা!

সে বছর বৃষ্টি হল না একটুও। বৃষ্টি না হওয়ায় পুকুরের জল শুকিয়ে ঘোলাটে হয়ে এল। তাই দেখে কম্বুগ্রীবের আশঙ্কার আর সীমা নেই।

একদিন হাঁস দু'টো বলল, 'বন্ধু কম্বুগ্রীব, কাল থেকে আর এই পুকুরে আসছি না! এ-পুকুরের জল শুকিয়ে আসছে। আমরা অন্য পুকুরে যাব।'

কম্বুগ্রীব বলল, 'বন্ধুরা, জলাভাবে আমারও প্রাণ যায় যায়, তোমরা একটা উপায় কর।'

হাঁসরা বলল, 'তোমায় ছেড়ে যেতে আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তুমি তো আমাদের মত উড়ে যেতে পারবে না। তোমার জন্য আমরা কী-বা করতে পারি!'

কম্বুগ্রীব বলল, 'মনু বলেছেন, আপৎ-কাল উপস্থিত হলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বন্ধুর জন্য যথেষ্ট যত্ন করবেন। তোমরাই আমার বন্ধু, এখন তোমাদের উপর আমার ভার দিলাম।'

অনেক পরামর্শ করে তারা একটা উপায় ঠিক করল। এক গাছা

শক্ত কাঠি কম্বুগ্রীব কামড়ে ধরে থাকবে, আর হাঁসরা কাঠির দু'ধার ঠোঁটে চেপে ধরে কম্বুগ্রীবকে নিয়ে উড়ে যাবে।

হাঁসরা বলল, 'কিন্তু বন্ধু, এতে যথেষ্ট ভয়ের কারণ আছে। উড়বার আগে বলে নিই—উড়ে যাওয়ার সময় কথা বলবার চেষ্টামাত্রও কোরো না। তা হলে সর্বনাশ!'

কম্বুগ্রীব বলল, 'সে-ভাবনা আমার, তোমাদের নয়।'

—'বেশ, তাই হোক।'—বলে হাঁসরা কচ্ছপকে নিয়ে পাখা মেলল।

পাহাড় ছাড়িয়ে মাঠ, মাঠের পর গ্রাম। গ্রামের উপর দিয়ে হাঁসরা উড়ে চলেছে কচ্ছপটাকে নিয়ে।

এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে পেয়ে গ্রামের ছেলেমেয়েরা হৈ-চৈ লাগিয়ে দিল—কী অদ্ভুত কাণ্ড! হাঁসরা কচ্ছপটাকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে!

গ্রামের ছেলেদের হৈ-চৈ আওয়াজ কম্বুগ্রীবের কানে গেল। তার বড় জানতে ইচ্ছা হল শব্দটা কিসের। সে জিজ্ঞাসা করতে গেল 'বন্ধু, হৈ-চৈ-টা...'

আর বলা হল না। মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল!

নিমেষে কম্বুগ্রীব ধপাস্ করে এসে পড়ল মাটিতে। তার বুকের হাড় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল।

কম্বুগ্রীবের কাহিনী শেষ করে মেয়ে-তিতিরটা বলল তার স্বামীকে, 'বুঝেছ বুদ্ধিমান, এইজন্যই আমি তোমায় সাবধান করে-ছিলাম। তুমি শুনলে না! শুনলে কি আর আমার ডিম দু'টো সমুদ্রের পেটে যেত! তোমার অবস্থা ঠিক যদ্ভবিষ্যের মত।'

পুরুষ-তিতির বলল, 'যদ্ভবিষ্য আবার কে?'

মেয়ে-তিতির বলল, 'বলছি তার কথা। শুনেও যদি তোমার কিছু শিক্ষা হয়!'

এই বলে মেয়ে-তিতির বলতে আরম্ভ করল, 'তিনটি মাছের কাহিনী।'

তিনটি মাছের কাহিনী

কোন এক পুকুরে ছিল তিনটি বড় বড় মাছ।

মাছগুলো যেমন বড়, তাদের নামগুলোও তেমনি গালভরা—অনাগতবিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি আর যদ্ভবিষ্য। নাম থেকেই তাদের চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

যা হোক, সেই তিনটি মাছের মধ্যে বড়ই সদ্ভাব ছিল। সারাদিন তারা গল্প-গুজব করে কাটাত ; কাজের মধ্যে খাওয়া, গল্প করা, আর ঘুমান।

একদিন পুকুরের জল থেকে উঁকি মেরে তারা দেখল, জেলেরা যাচ্ছে সেই পুকুরের ধার দিয়ে। তারা কান পেতে শুনল, জেলেরা বলাবলি করছে, 'কাল সকালে এসে এ-পুকুরের মাছগুলো ধরতে হবে। বেশ বড় বড় মাছ আছে এ-পুকুরে, মনে হচ্ছে।'

জেলেদের কথা শুনে ভয়ানক ভাবনা হল মাছদের। তারা বলল, 'জেলেদের কথা তো শুনলাম ; এস আমরা এ-বিষয়ে একটা পরামর্শ করি।'

প্রত্যুৎপন্নমতি বলল, 'এ-বিষয়ে আর পরামর্শ কি? বিপদ উপস্থিত, পলায়ন ছাড়া উপায় দেখি না।'

অনাগতবিধাতা বলল, 'আমারও সেই মত। আমার মনে হয়, আপাততঃ কোথাও চলে যাই। বিপদ কেটে গেলে আবার আমরা আসব।'

যদ্ভবিষ্য বলল, 'তোমাদের পরামর্শ আমি মানতে প্রস্তুত নই। তোমরা বড় ভীরু। এক কথাতেই কি পিতৃপুরুষের বাসস্থান ছেড়ে চলে যেতে আছে? যদি আয়ু শেষ হয়েই থাকে, তবে বিদেশে গেলেও মৃত্যু হবে। আরও একটা কথা আছে—কোন বস্তু অরক্ষিত অবস্থায় থাকলেও দৈববশে রক্ষা পায় ; আবার কোন বস্তু সযত্নে রক্ষিত হলেও দৈবে তা নষ্ট হয়।'

অনাগতবিধাতা বলল, 'কাক, কাপুরুষ, আর হরিণ—শুনেছি, এরাই বিদেশে যেতে ভয় পায়। তুমি একটি কাপুরুষ!

যদ্ভবিষ্য বলল, 'তোমরাই ভুল বুঝেছ। জেলেরা যে আসবেই, তার ঠিক কি? না-ও তো আসতে পারে?'

প্রত্যুৎপন্নমতি বলল, 'ঠিক বলেছ। কিন্তু যদি আসে?'

যদ্ভবিষ্য বলল, 'তখন দেখা যাবে।'

যদ্ভবিষ্যের কথায় ভরসা না পেয়ে অনাগতবিধাতা আর প্রত্যুৎপন্নমতি অন্য পুকুরে চলে গেল।

এদিকে পরদিন সকালবেলা ঝপাৎ করে জেলেদের জাল পুকুরে পড়ল। যদ্ভবিষ্য পালাবার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু যতই সে চেষ্টা করল, ততই সে জালে জড়িয়ে গেল। জেলেরা তাকে টেনে তুলল। যদ্ভবিষ্য নিজের বোকামি বুঝতে পারল, কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গিয়েছে।

স্ত্রীর কথা শুনে পুরুষ-তিতির বলল, 'ভদ্রে, তুমি কি আমায় যদ্ভবিষ্যের সঙ্গে তুলনা করছ? কিন্তু আমি তার মত বোকা নই। আমি ঠোঁট দিয়ে এই সমুদ্র শোষণ করে ফেলব। দেখি সে ডিম ফিরিয়ে দেয় কিনা।'

তিতিরের কথা শুনে তার স্ত্রী এত দুঃখেও না হেসে থাকতে পারল না। সে বলল, 'তোমার বুদ্ধির দৌড় দেখে না হেসে থাকতে পারলাম না। নিজের শক্তি বা বল না জেনে যে অপরের সঙ্গে বিবাদ করতে যায়, তার দশা পতঙ্গের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত হয়।'

পুরুষ-তিতির বলল, 'গিন্নী, তোমার কথা স্বীকার করি। কিন্তু এ-ও জেনো, যার উৎসাহ আছে, সে ক্ষুদ্র হলেও বিক্রমে মহৎকে অভিভূত করতে পারে। দেখ, হাতী বড় হলেও সিংহের সঙ্গে পারে না ; তা ছাড়া, এত বড় একটা হাতী সামান্য অঙ্কুশ দ্বারা চালিত হয়। আমি চেষ্টা করলে ঠোঁট দিয়ে সমুদ্র শোষণ করতেও পারি।'

মেয়ে-পাখী ঠাট্টা করে বলল, 'বীরের মত কথাই বলেছ বটে! জাহ্নবীর আঠারশত নদীর জলে পুষ্ট সমুদ্রকে তুমি ঠোঁট দিয়ে শোষণ করবে! যদি সত্যই সমুদ্রকে শাসন করতে চাও, তবে তোমার আত্মীয়-বন্ধুদের খবর দাও। অনেক অসার বস্তুও মিলিত হলে অনেক সময়

বড় বড় কাজ করতে পারে। একবার চটক পাখী, কাঠঠোকরা, মৌমাছি আর ব্যাঙ মিলে এক হাতীকে জব্দ করতে পেরেছিল।'

পুরুষ-তিতির বলল, 'শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে হাতীকে জব্দ করার কাহিনীটা।'

তখন মেয়ে-তিতির বলতে আরম্ভ করল 'বুদ্ধিমান ব্যাঙ'-এর গল্প।
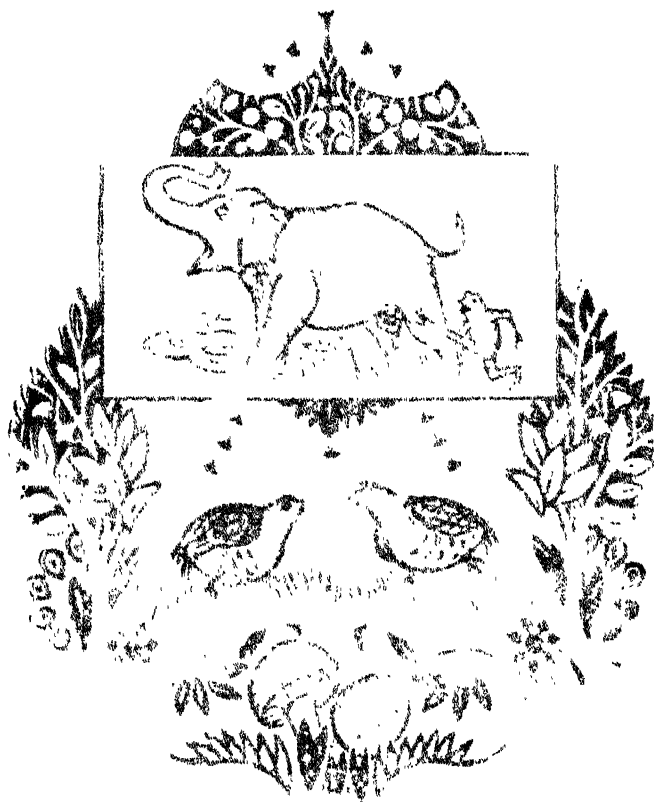
বুদ্ধিমান ব্যাঙ

আয়ুর জোরেই চটক পাখী আর তার বৌ বেঁচে গেল। বাঁচল না তাদের বাচ্চাগুলো। বনের সেই বুড়ো হাতীটা এসে ডাল-সুদ্ধ তাদের বাসাটা ভেঙে দিয়ে গেল।

বাচ্চাগুলোর শোকে চটক আর চটকী বসে বসে কাঁদছিল। কান্না শুনে তাদের প্রতিবেশী কাঠঠোকরা ছুটে এল। সে বলল, 'কাঁদছ কেন চটক-বৌ? কাঁদছ কেন চটক ভাই? কী হয়েছে?'

তারা বলল, 'বুড়ো হাতী আমাদের বাসা ভেঙে দিয়েছে, বাচ্চাগুলোকে পায়ে পিষে মেরেছে!'

কাঠঠোকরা বলল, 'ওমা, তাই তো! গোদা হাতীটার এত কাণ্ড! কেঁদো না ভাই চটক, আমরা এর প্রতিশোধ নেব। হাতীকে জব্দ করব।'

চটক বলল, 'আমরা কি আর হাতীর সঙ্গে পেরে উঠব?'

কাঠঠোকরা জোর দিয়ে বলল, 'হোক না হাতী। তাই বলে গরীবের বাসা ভেঙে দিয়ে যাবে? আস্পর্ধা তো কম নয়! চল আমার বন্ধু মধুকরের কাছে যাই। পরামর্শ করতে হবে।'

কদমগাছের ডালের ফাঁকে মস্ত এক চাক। সেইখানে মধুকরের বাসা। চটক আর কাঠঠোকরা এসে অনেকক্ষণ মধুকরের সঙ্গে পরামর্শ করল। মধুকর বলল, 'তোমার সঙ্গে আমিও একমত। পাখীদের বাসা ভেঙে দেবার ফলটা হাতীকে হাতে হাতে দেওয়া চাই।...চল যাই, আমার বন্ধু থ্যাবড়ানাক ব্যাঙের কাছে। তার মত বুদ্ধিমান আর দেখি না।'

এঁদো ডোবার ধারে থ্যাবড়ানাক ব্যাঙের বাড়ি। মধুকর এসে ডাকল, 'থ্যাবড়ানাক দাদা ! ঘরে আছ?'

ব্যাঙ থপ্ থপ্ করে বেরিয়ে এল। এসে বলল, 'আরে মধুকর দাদা যে! কি খবর? এই যে আপনারাও এসেছেন! কী সৌভাগ্য আমার! বসুন বসুন। তারপর কী মনে করে এই সাতসকালে?'

তখন মধুকর সবিস্তারে হাতীর কাণ্ড বলল। শুনে ব্যাঙের তো গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে বলল, 'উঃ, কী পাষণ্ড হাতীটা! কচি বাচ্চাগুলোকে পায়ে পিষে মেরে ফেলেছে! এত অহংকার তো ভাল

নয়! এই আমি বললুম—হাতীর পতন ঘটবেই। অহংকারই পতনের মূল কিনা।'

মধুকর বলল, 'হাতীকে আমরা সাজা দিতে চাই। তাই আপনার কাছে পরামর্শ চাইছি। গায়ের জোরে তো হাতীর সঙ্গে পেরে উঠব না আমরা।'

ব্যাঙ তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'গায়ের জোরকে জোর বল? বুদ্ধির জোরই আসল জোর। তার চেয়ে জোর একতার। আমরা চারজন ইচ্ছে করলে গোদা হাতীকে লাথি মেরে আসতে পারি।'

চটক বলল, 'সেই উপায়ই করুন। বলুন, কেমন করে তা সম্ভব হবে।'

থ্যাবড়ানাক ব্যাঙ তখন গোপনে তাদের পরামর্শ দিল। পরামর্শ শুনে সবাই খুশী হয়ে চলল হাতীর আস্তানার দিকে।

ততক্ষণে বেলা দুপুর হয়েছে। বুড়ো হাতী ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছে। ব্যাঙের পরামর্শমত মধুকর গিয়ে হাতীর কানের কাছে এমন সুন্দর গুন্-গুন্ সুর ভাঁজতে লাগল যে, সেই সুর শুনে হাতীর চোখ বুজে এল। যেই না হাতী চোখ বুজল, অমনি কাঠ-ঠোকরা গিয়ে দু'ঠোকর দিয়ে হাতীর ক্ষুদে চোখ দুটো কানা করে দিল। হাতী তখন লাফিয়ে উঠে ছুটতে লাগল। অন্ধের মত হাতী ছুটতে লাগল সেই ভরা দুপুরে। ছুটতে ছুটতে পরিশ্রমে আর রোদ্রে তার তেষ্টা পেয়ে গেল খুব। কিন্তু কোথায় জল! চোখে যে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না!

সময় বুঝে সেই থ্যাবড়ানাক ব্যাঙ কাদা-পুকুরের ভিতরে গিয়ে মক-মক করে ডাকতে লাগল। ব্যাঙের ডাক লক্ষ্য করে হাতী সেই দিকে ছুটে চলল জলের আশায়। কিন্তু তার সব আশা মাটি হল! কাদার মধ্যে পড়ে গিয়ে সে আর উঠতে পারল না। থ্যাবড়ানাক ব্যাঙ তাকে লাথি মেরে চলে এল।

মেয়ে-তিতিরের গল্প শেষ হতে না হতেই পুরুষ-তিতির বলল, 'ঠিক বলেছ গিন্নী। আমি স্বজাতীয়দের কাছেই চললাম।'

গাঙ-চিল, টিয়া, ময়না, ভরত, শালিখ, ময়ূর—সবাই খবর পেয়ে একসঙ্গে এসে জুটল। সমুদ্র তিতিরের ডিম নিয়ে গেছে শুনে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা বলাবলি করতে লাগল, 'এর একটা প্রতিকার হওয়া উচিত। আজ তিতিরের ডিম নিয়েছে, কাল আমাদের ডিম নেবে। চল আমরা আমাদের রাজা গরুড়ের কাছে যাই।'

গরুড়ের কাছে গিয়ে সবাই কেঁদে পড়ল—'মহারাজ, আপনি না বাঁচালে প্রজাকে কে বাঁচাবে? আপনি আমাদের বাঁচান।'

গরুড় সব শুনে বলল, 'তোমরা যে যার ঘরে যাও। আমি নিশ্চয় এর প্রতিকার করব।'

পাখীরা সব চলে এল।

এমন সময় বিষ্ণুদূত এসে বলল, 'গরুড়, প্রভু তোমায় ডাকছেন।'

গরুড় বলল, 'বিষ্ণুকে গিয়ে বল, আমি যেতে পারব না। তিনি অন্য ভৃত্য নিযুক্ত করুন।'

বিষ্ণুদূত ফিরে গিয়ে বিষ্ণুকে সব বলল। তখন বিষ্ণু নিজেই এলেন গরুড়ের কাছে। বিষ্ণুকে দেখে গরুড় খুব লজ্জিত হয়ে বলল, 'প্রভু, আপনার আদেশ অমান্য করেছি বলে আমি লজ্জিত। কিন্তু প্রজাদের কোন উপকার যদি না করতে পারি, তবে আমার বৃথা রাজা হওয়া।'

গরুড় তখন বিষ্ণুকে তিতিরের ডিম-চুরির ঘটনা বলল।

শুনে বিষ্ণু বললেন, 'চল দেখি সমুদ্রের কাছে। কেমন তার ক্ষমতা! অপরের ডিম চুরি করা নিশ্চয়ই তার অপরাধ।'

সমুদ্রের কাছে গিয়ে বিষ্ণু সমুদ্রকে বললেন, 'ফিরিয়ে দাও তিতিরের ডিম।'

সমুদ্র জবাব দিল না। তখন বিষ্ণু ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

ভয় পেয়ে সমুদ্র তিতিরের ডিম ফিরিয়ে দিল।

তিতির পাখী ডিমজোড়া ফিরে পেয়ে খুশী হল সমুদ্রের লজ্জার আর সীমা রইল না।

এতগুলো গল্প বলে দমনক বলল, 'বন্ধু সঞ্জীবক, আমার মনে হয়, শত্রুকে ক্ষুদ্র মনে করে তার সঙ্গে বিবাদ করতে যাওয়া তোমার ঠিক হবে না। পালিয়ে যাওয়াই এক্ষেত্রে সঙ্গত। শাস্ত্রে আছে, 'আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ'—প্রয়োজন হলে আত্মার জন্য পৃথিবীকেও ত্যাগ করবে।'

সঞ্জীবক বলল, 'না বন্ধু, আমি মন স্থির করেছি। প্রাণ দিতে হয় পিঙ্গলকের হাতেই দেব। এতদিন সে আমায় যথেষ্ট স্নেহ করে এসেছে।...এখন বল তো বন্ধু, কেমন করে বুঝব যে, সে আমায় আক্রমণ করবে?'

দমনক বলল, 'দেখবে তার চোখ দু'টো রক্তবর্ণ। সে ঘন ঘন তোমার দিকে তাকাচ্ছে। আর অন্যদিনের মত তোমায় ডেকে কথা বলছে না।'...এই বলে দমনক বিদায় নিল।

চিন্তিতমনে দমনক করটকের কাছে এল। করটক জিজ্ঞাসা করল, 'খবর কি বন্ধু, কি করে এলে?'

দমনক॥ পিঙ্গলক আর সঞ্জীবকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এসেছি। যে বীজ রোপণ করে এসেছি তা এখন দৈবাধীন। এরূপ কথিত আছে যে, দৈব সহায় হলে সবই হয়, নইলে কিছুই হয় না। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। উদ্যোগী পুরুষরাই লক্ষ্মী-লাভ করে থাকে, কাপুরুষেরা দৈব দৈব বলে চিৎকার করে।

করটক॥ ধন্য তোমার উদ্যমশীলতা! না জানি তোমার ভেদ-নীতির ফল কী দাঁড়ায়! তুমি সুখমগ্ন সঞ্জীবক আর পশুরাজ

পিঙ্গলককে দুঃখে ফেলেছ! জন্ম-জন্মান্তরে তোমায় দুঃখ ভোগ করতে হবে।

দমনক॥ বন্ধু, নীতিশাস্ত্রে তোমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই। তাই বাজে বকছ। নীতিশাস্ত্র বলে—শত্রু আর রোগকে বাড়তে দিতে নেই, বেড়ে উঠলে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। সঞ্জীবক মারা গেলে আমাদের খাদ্য হবে, শত্রুতা-সাধন হবে, মন্ত্রিত্ব দৃঢ় হবে, আর আত্মতৃপ্তি-লাভ হবে। এ সুযোগ কি ছাড়তে পারি?

করটক॥ নীতিশাস্ত্রে এ-কথাও কি লেখা নেই বন্ধু, যিনি যুদ্ধ না করে সাম দ্বারা সকল কাজ নিষ্পন্ন করতে পারেন, তিনিই উপযুক্ত মন্ত্রী। তোমার মত মূর্খকে উপদেশ দিলেও তাতে কোনই ফল হবে না, জানি। মূর্খ বানরকে উপদেশ দিয়ে চটক-পাখীর বিপদই হয়েছিল।

দমনক॥ কেন, কেমন করে বিপদ হল?

তখন করটক 'নিজের চরকায় তেল দাও' এই উপদেশপূর্ণ গল্পটি বলল।
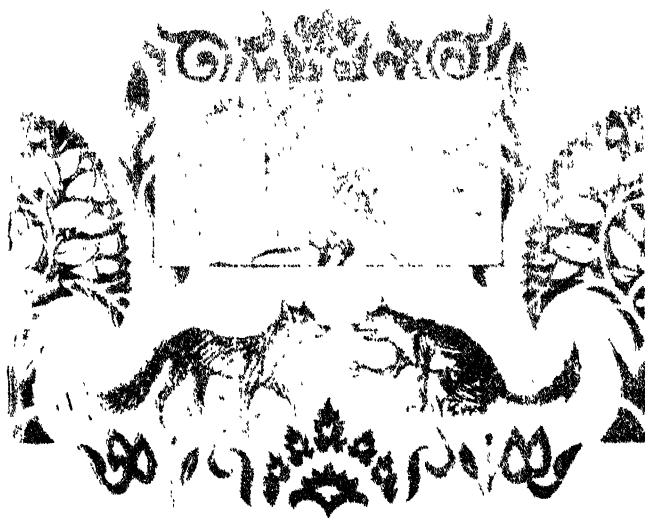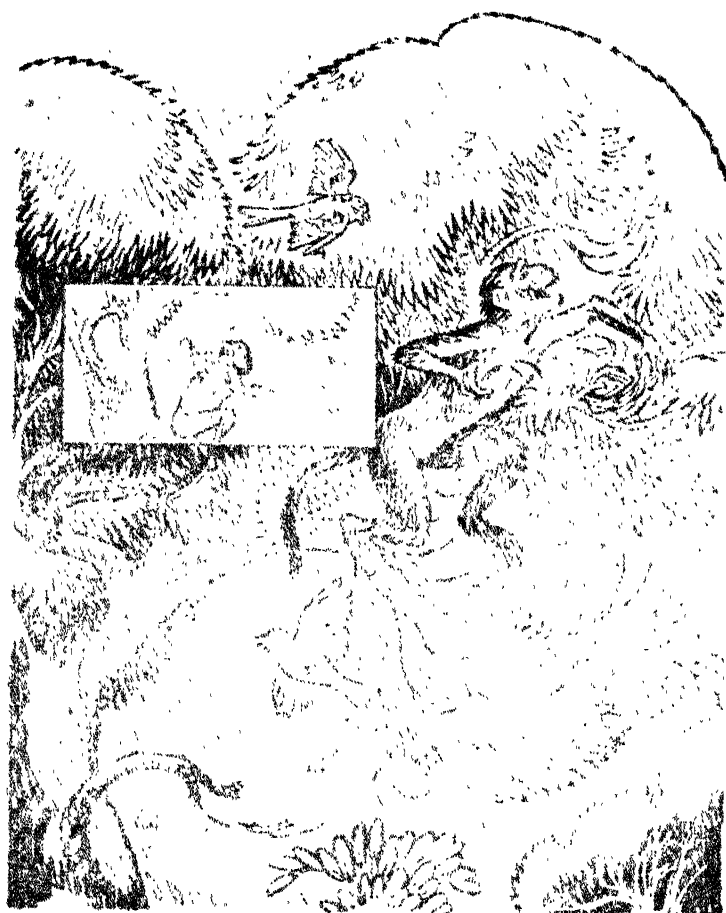
নিজের চরকায় তেল দাও

সারাদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল। তখন বিকালবেলা। বৃষ্টির জোর আরও বেড়ে গেল, বাতাসের বেগ আরও প্রবল হয়ে উঠল।

শমীগাছটার উঁচু ডালে বাসা বেঁধে থাকত একজোড়া পাখী—

চটক আর চটকী। চটক বলল, 'চটকী, ভাগ্যে বাসাটা মজবুত করে বেঁধেছিলাম। নইলে ভিজে মরতে হত।'

চটকী বলল, 'আমিই তোমায় পরামর্শ দিয়েছিলাম, সেটা বল।'

চটক বলল, 'তা বটে, তা বটে।'

এমন সময় গাছের তলায় কিসের একটা শব্দ হল। চটক উঁকি মেরে দেখল, একটা বানর ভিজতে ভিজতে এসে শমীগাছটার তলায় আশ্রয় নিয়েছে।

চটক বলল, 'দেখ, দেখ গিন্নী, আমাদের অবস্থাও এরকম হত কি না।'

চটকী দেখল, তাই তো! একটা বানর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, আর শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। দেখে চটকীর বড় কষ্ট হল। সে বানরকে ডেকে বলল, 'ভিজছ কেন ভাই? নিজের বাসায় যাও। অসুখ-বিসুখ করবে যে!'

বানর রেগে বলল, 'তোর তাতে কী রে? বাসায় আছিস, চুপ করে থাক।'

চটকী বলল, 'বলি, মানুষের মত হাত-পা থাকতে বাসাও একটা বাঁধতে পার নি? আমরা ঠোঁট দিয়ে যা পারি, তা-ও পার না?'

বানর আরও রেগে বলল, 'আমি বাসা করব না, তোর তাতে কি?'

চটকী বিরক্ত হয়ে বলল, 'তবে ভিজে মর! ভালো কথার কি আর দিন আছে?'

বানর বলল, 'কী! আমায় বলিস মরতে! তোর বাসার বড় অহংকার হয়েছে।'

এই বলে বানর তরতর করে গাছে উঠে চটকদের সাধের বাসাটা ভেঙে দিল। ওদের কষ্টের আর সীমা রইল না।

গল্প শেষ করে করটক বলল, 'মূর্খকে উপদেশ দিলে তার কোন

ফল হয় না। তা ছাড়া, তুমি শুধু মূর্খ নও, কুবুদ্ধিও। তোমার অবস্থা হবে পাপবুদ্ধির মত।'

দমনক জানতে চাইল, পাপবুদ্ধির কি অবস্থা হয়েছিল।

তখন করটক 'গাছ সাক্ষী'র গল্প বলতে লাগল।
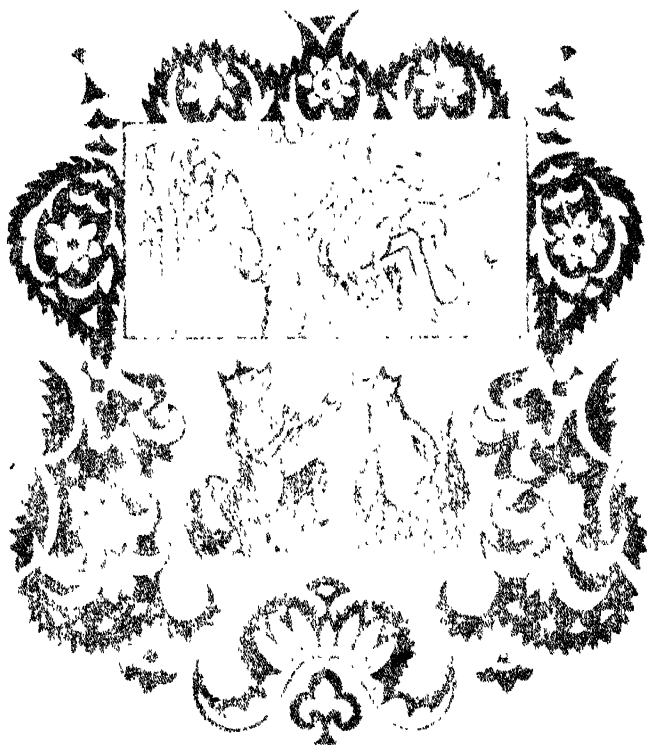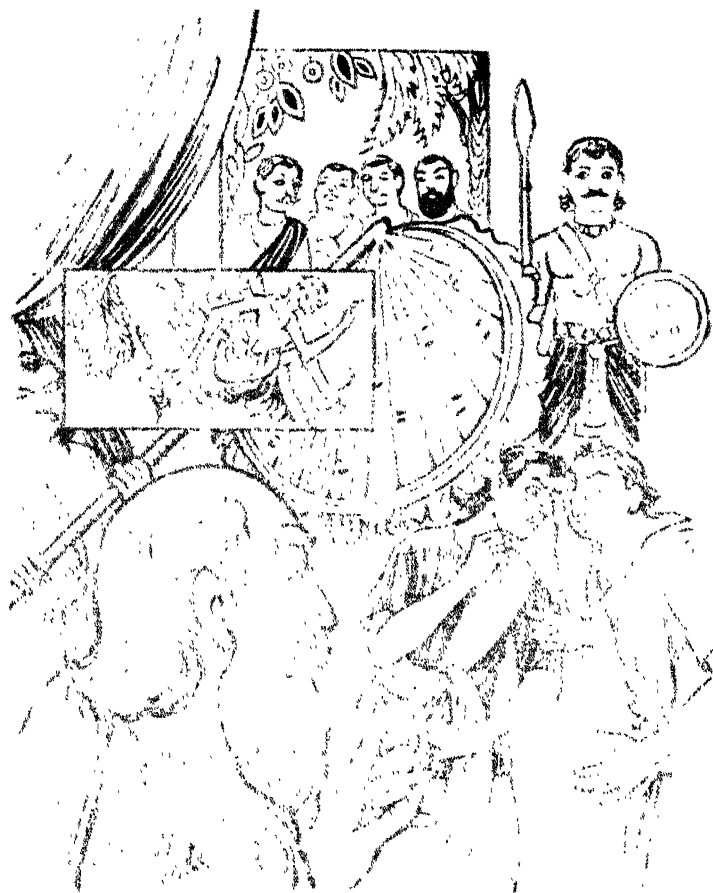
গাছ সাক্ষী

দুই বন্ধুতে গলায় গলায় ভাব। অ-ভাব যা কিছু, সে কেবল স্বভাবের। একজন ছিল যেমন ধার্মিক. অপরজন ছিল তেমনি অ-ধার্মিক। তাই একজনকে লোকে বলত 'ধর্মবুদ্ধি', আর অপরজনকে 'পাপবুদ্ধি।'

একবার ধর্মবুদ্ধি আর পাপবুদ্ধি বিদেশে ব্যবসা করতে গেল। ভগবান সহায় ছিলেন, আর লক্ষ্মীদেবীর কৃপা ছিল, তাই সে-বছর তারা অনেক—অনেক টাকা লাভ করল। টাকা-ভাগ হল আধাআধি।

লাভের টাকা-পয়সা নিয়ে দুই বন্ধু অনেক দিন পর দেশে ফিরে এল। নিজেদের গাঁয়ে ঢুকতে প্রথমেই এক বন। দুই বন্ধুতে সেই বনের ছায়ায় বিশ্রাম করতে করতে বলাবলি করল, 'এত টাকা নিয়ে গাঁয়ে যাওয়া উচিত হবে না। চোর-ডাকাতের ভয় আছে। তার উপরে আছে আত্মীয়দের হিংসা। কথায় বলে, টাকায় মুনিরও মন টলে!' এই ভেবে তারা সামান্য টাকা নিজেদের কাছে রেখে বাকী টাকা একটা বড় বটগাছের তলায় পুঁতে রেখে গাঁয়ে এল।

গাঁয়ে এসে ধর্মবুদ্ধি আর পাপবুদ্ধি সুখে দিন কাটাতে লাগল।

একদিন পাপবুদ্ধি এসে বলল, 'বন্ধু ধর্মবুদ্ধি, কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়েছে। চল, তুলে নিয়ে আসি।' ধর্মবুদ্ধি সহজেই রাজী হয়ে গেল, কেননা, টাকার প্রয়োজন তারও ছিল।

বনে এসে দুই বন্ধু মিলে কত খোঁড়াখুঁড়ি করল, কিন্তু রক্ষিত সেই টাকা পাওয়া গেল না! তখন পাপবুদ্ধি বলল, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে ধর্মবুদ্ধি, টাকাগুলো তুমিই হয়তো চুরি করেছ।'

ধর্মবুদ্ধি বলল, 'লোকে আমায় ধর্মবুদ্ধি বলে ডাকে, জীবনে আমি পরের ধনে হাত্ দিই না। বোধ হয় তুমিই টাকাগুলো সরিয়েছ।'

এইভাবে কথা কাটাকাটি করে দু'জনেই রাজার কাছে চলল বিচারপ্রার্থী হয়ে।

অভিযোগ শুনে রাজপুরুষেরা বললেন, 'তোমাদের কোন সাক্ষী আছে? দুজন দুজনকে দোষী বলছ। কে যে দোষী, সাক্ষী না হলে তা বোঝা যাবে না। কোন লিখিত প্রমাণ আছে কি?'

ধর্মবুদ্ধি বলল, 'ধর্মাবতার, আমাদের লিখিত কোন প্রমাণ বা সাক্ষী নেই।'

পাপবুদ্ধি বলল, 'ধর্মাবতার, আমরা বনদেবতাকে সাক্ষী মানতে পারি। তাঁর সাক্ষী আমি মেনে নিতে প্রস্তুত আছি।'

বিচারক রাজপুরুষ বললেন, 'বেশ, কাল সকালেই আমরা সেই বনে যাব। বনদেবতার সাক্ষ্য নেব এবং বিচার করব সেইখানেই।'

বাড়ি এসে পাপবুদ্ধি তার বাপকে সব কথা খুলে বলল। সে বলল, 'টাকাগুলো আমিই চুরি করেছি। আমি ধর্মবুদ্ধিকে ঠকাতে চাই।'

বাবা বললেন, 'আমি কি করতে পারি?'

পাপবুদ্ধি বলল, 'আপনি এখনি গিয়ে বনের বড় বটগাছটার কোটরে বসে থাকুন। যখন গাছকে জিজ্ঞাসা করা হবে কে চোর, আপনি বলবেন—ধর্মবুদ্ধি চোর।'

তার বাবা এ-কাজ করতে সহজেই রাজী হয়ে গেলেন।

পরদিন সকালবেলা ধর্মবুদ্ধি, পাপবুদ্ধি ও বিচারক রাজপুরুষেরা বনে এসে উপস্থিত হলেন।

পুরাতন বটগাছটার উদ্দেশে বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে বনের অধিষ্ঠাতা দেবতা বটগাছ, আপনি বলুন, ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধির মধ্যে কে চোর?'

সকলে অবাক হয়ে শুনল, গাছের কোটর থেকে উত্তর এল—'ধর্মবুদ্ধি চোর। পাপবুদ্ধিকে না জানিয়ে সে-ই টাকা চুরি করেছে।'

বিচারক বললেন, 'আর সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই। ধর্মবুদ্ধি, তোমায় ধিক্। তোমায় কঠোর সাজা পেতে হবে।'

ধর্মবুদ্ধি বলল, 'ধর্মাবতার, আমায় কিছুক্ষণ সময় দিন।'

এই বলে ধর্মবুদ্ধি কতকগুলো শুকনো কাঠ যোগাড় করে তাতে

আগুন ধরিয়ে বটগাছের কোটরে ফেলে দিল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। তখন চিৎকার করতে করতে তার মধ্য থেকে পাপ-বুদ্ধির বাবা বেরিয়ে এলেন। তাঁর অর্ধেকটা শরীর পুড়ে গেছে, যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করছেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি পাপবুদ্ধির কুকর্মের কথা বলে দিলেন।

বিচারক তখন ধর্মবুদ্ধির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা করে বললেন, 'ধর্মবুদ্ধি, তুমি সত্যই ধর্মবুদ্ধি। আর পাপবুদ্ধি, তোমার কঠিন সাজা হবে। তুমি চোর।'

এই বলে তিনি পাপবুদ্ধির মৃত্যুর আজ্ঞা দিয়ে বললেন, 'পাপবুদ্ধি, কেবল উপায় চিন্তা করেছিলে, অপায় চিন্তা কর নি, তারই এই ফল। ভালো-মন্দ দুই দিক বিচার না করে যে ব্যক্তি কোন কাজ করে, তার বকের মত অবস্থা হয়।'

ধর্মবুদ্ধি জিজ্ঞাসা করল, 'বকের কি হয়েছিল?'

তখন বিচারক 'খাল কেটে কুমীর আনা'-র গল্পটি বললেন।
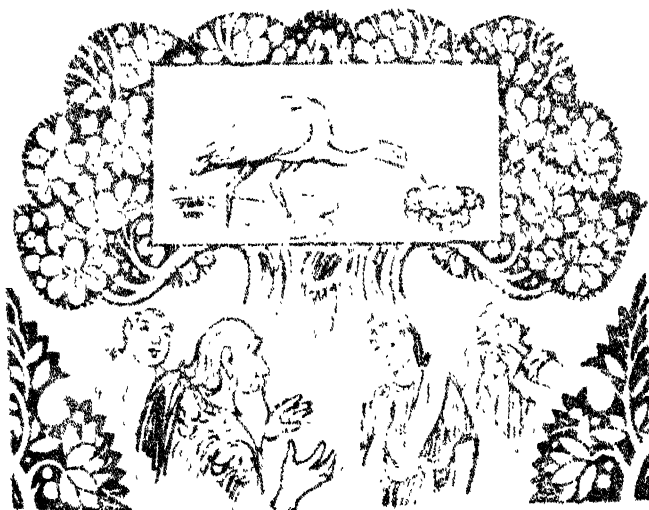
খাল কেটে কুমীর আনা

এক বক গিয়ে কাঁকড়াকে জিজ্ঞাসা করল, ‘বলতে পার ভাগ্নে কাঁকড়া, আমাদের বাচ্চা-খেকো সাপটাকে কেমন করে মারতে পারি?’

কাঁকড়া জিজ্ঞাসা করল, ‘সাপটা থাকে কোথায়?’

বক বলল, ‘যে-গাছে আমাদের বাসা, সেই গাছের গর্তেই সে

থাকে। আমরা বেরিয়ে আসতেই বাচ্চাগুলোকে ধরে ধরে খায়। কী জ্বালায় যে পড়েছি!'

কাঁকড়া মনে মনে বলল, দাঁড়াও বক-মামা। তোমার সর্বনাশের পথ করে দিচ্ছি। তুমি না আমাদের বাচ্চাগুলোকে ধরে ধরে খাও! তারপর বককে বলল, 'আহা হা! কচি বাচ্চাগুলোকে খেয়ে ফেলছে! কী নিষ্ঠুর! তুমি এক কাজ কর মামা—ছোট ছোট মাছ এনে সাপের গর্তটা থেকে আরম্ভ করে কোন বেজির গর্ত অবধি ছড়িয়ে দাও। দেখবে, মাছের লোভে বেজি এসে সাপটাকে খাবে।'

বক বলল, 'ঠিক বলেছ। আমি তা-ই করব।'

মাছের লোভে বেজি এল। সাপের সঙ্গে লড়াই করে সেই বেজি সাপটাকে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলল। কিন্তু বেজি তাতেই সন্তুষ্ট রইল না, এবার থেকে সে বকেদের বাচ্চাগুলোকেও ধরে ধরে খেতে লাগল।

তখন সেই বক কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'হায়, আমি দুষ্ট কাঁকড়ার কথায় খাল কেটে কুমীর আনলাম! সেই কুমীরেই আমাদের সর্বনাশ করল!'

গল্প শেষ হলে করটক দমনককে বলল, 'তুমিও পাপবুদ্ধির মত উপায় চিন্তা করেছ, অপায় চিন্তা করনি। অতএব তুমিও পাপবুদ্ধি। তুমি সঞ্জীবকের মৃত্যুর কথাই ভেবেছ, কিন্তু প্রভু পিঙ্গলকের যদি কোন অনিষ্ট হয়, তখন কি হবে? তোমার মত কুবুদ্ধি লোকের সংস্রবে থাকা উচিত নয়। তুমি পিঙ্গলকের মত পশুরাজের বিপদ ঘটাতে পার, আমার বিপদ তো আরও সহজে ঘটাতে পারবে। তোমার মত মূর্খের সহিত বন্ধুত্বে কাজ নেই। শাস্ত্রে আছে যে পণ্ডিত যদি শত্রু হন, তা-ও বরং ভাল, কিন্তু মূর্খ-বন্ধু ভালো

নয় ; কেননা, তাতে মাছি তাড়াতে মূর্খ বানরকে নিযুক্ত করার মত বিপদ হবে।'

দমনক বলল, 'কি করেছিল মূর্খ বানর?'

করটক॥ একান্তই যদি শুনবে, তবে 'মূর্খ বন্ধু'-র গল্পটা বলি শোন।
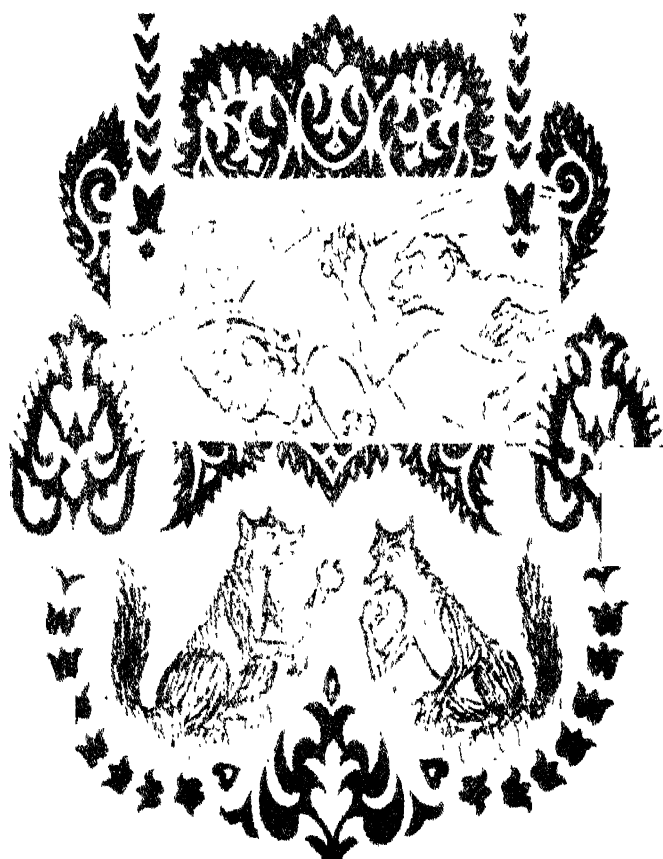
মূর্খ বন্ধু

রাজার ছিল এক পোষা বানর।

মানুষের মত কথা বলতে পারত না বটে সে, কিন্তু মানুষের প্রায় সব কাজই সে করতে পারত। সে থাকত রাজার পাশে পাশে। রাজা

তাকে ভালোবেসে শিকারে নিয়ে যেতেন, যুদ্ধে নিয়ে যেতেন, রাজসভায় নিয়ে যেতেন। বলতে কি, বানরটার হাতেই ছিল রাজার পরিচর্যার ভার।

একদিন দুপুরবেলায় রাজা শুয়েছেন। বানরকে বললেন, 'আমায় হাওয়া কর।'

বানর চামর দিয়ে হাওয়া করতে লাগল। হাওয়া পেয়ে রাজা ঘুমিয়ে পড়লেন। বানরটা পাশে বসে রইল চুপ করে। এমন সময় কোথা থেকে একটা মাছি ভন্-ভন্ করে উড়ে এসে রাজার মুখে বসল। পাছে রাজার ঘুম ভেঙে যায়, সেই ভয়ে বানর চামর দিয়ে মাছিটাকে তাড়িয়ে দিল। একটু পরে আবার এসে মাছিটা সেখানে বসল। আবার সে তাকে তাড়িয়ে দিল। সেই বিরক্তিকর মাছিটা আবার এল, এসে রাজার মুখে বসল।

বারে বারে তাড়িয়ে দিলেও আবার আসে মাছিটা। এ তো ভারি পাজি! রাগ হল বানরের। সে গিয়ে রাজার একটা তলোয়ার নিয়ে এল। মাছিটা তখনও বসে আছে রাজার মুখের উপর। বানর বলল, 'মাছি, তোকে এই তলোয়ারের এক কোপে শেষ করব।'

যেমনি বলা তেমনি কাজ। মাছি তাড়াতে গিয়ে মূর্খ বানর রাজার মুখে তলোয়ারের এক কোপ বসিয়ে দিল। চিৎকার করে উঠলেন রাজা, 'ওরে মূর্খ, তুই আমায় বধ করেছিস!'

গল্প শেষ করে করটক বলল, 'বুঝলে বুদ্ধিমান দমনক, তোমার মত মূর্খ বন্ধু যার বা তোমার উপর ভরসা করে যে, তারও এই পরিণাম হবে।'

* * *

ওদিকে দমনক চলে আসবার পর সঞ্জীবক চিন্তা করতে লাগল, 'হায়, আমি এ কী করেছি! তৃণভোজী হয়ে মাংসাশী জন্তুর অনুগত

হয়েছি! এখন কী করি? যদি পলায়ন করি, পথে অন্য পশুতে বধ করতে পারে। তার চেয়ে পিঙগলকের কাছেই যাই—সে রাখে রাখুক, মারে মারুক!'

সঞ্জীবক এই ভেবে পশুরাজ পিঙগলকের কাছাকাছি গিয়ে বসে রইল, আর লক্ষ্য করতে লাগল, দমনক যে যে লক্ষণ বলে এসেছে, পিঙগলকের সেই সেই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি না।

পিঙগলকও আড়চোখে সঞ্জীবকের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। সে মনে মনে চিন্তা করল, দমনক ঠিকই বলে গেছে। সঞ্জীবক তো অন্য দিনের মত ব্যবহার করছে না! নিশ্চয়ই ওর কুমতলব আছে। অতএব আর বিলম্ব কেন?

পিঙগলক এক লাফে সঞ্জীবককে আক্রমণ করল। সঞ্জীবকও সাধ্যমত যুদ্ধ করল। কিন্তু বর্ধমানক নামক বণিকের সেই ভারবাহী বলদ যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারল না!

কিছুক্ষণ পরে দমনকের সঙ্গে পিঙগলকের দেখা হল।

পিঙগলক দুঃখ করে বলল, 'মন্ত্রী দমনক, আমি সঞ্জীবককে বধ করে ভালো করি নি। শুনেছি, যারা মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন বা বিশ্বাস-ঘাতক, তাদের নরকবাস হয়।'

দমনক বলল, 'মহারাজ, একটা তৃণভোজী পশুকে হত্যা করে শোক প্রকাশ করা আপনার পক্ষে শোভা পায় না। কথিত আছে, দয়ালু রাজা, সর্বভোজী ব্রাহ্মণ, নির্লজ্জা স্ত্রী, দুষ্টবুদ্ধি বান্ধব, প্রতিকূলাচারী ভৃত্য, অসতর্ক কর্মচারী—কখনও এদের উপর আস্থা রাখতে নেই। পণ্ডিতেরা মৃত বা জীবিত ব্যক্তির জন্য কখনও শোক প্রকাশ করেন না। আপনারও এরূপ দুঃখ করা উচিত নয়।'

এইভাবে দমনকের মন্ত্রিত্ব আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

এর পর আরম্ভ হল দ্বিতীয় তন্ত্রের 'মিত্রপ্রাপ্তি'-র গল্প।

॥ প্রথম তন্ত্র সমাপ্ত ॥

পঞ্চতন্ত্রঃ দ্বিতীয় তন্ত্রঃ মিত্র প্রাপ্তি

তেপান্তরের মাঠ।

সেই মাঠের মধ্যিখানে কতকালের পুরানো এক বটগাছ। যত রাজ্যের কাক এসে বাসা বেঁধেছে সেই বটগাছে। এই গাছেই তাদের

চৌদ্দপুরুষের বাসা। এই গাছের ছায়ায় পথশ্রান্ত কত পথিক এসে বিশ্রামলাভ করে। লোকে বলে, ধন্য সেই গাছ, যার ছায়ায় মৃগগণ নিদ্রা যায়, পক্ষিগণ যার ফল খেয়ে বেঁচে থাকে, কীটসমূহ যার কোটরে আবৃত থাকে, বানর যার শীর্ষে আশ্রয় নেয়, মৌমাছিরা যার ফুলের মধু নির্ভয়ে পান করে, আর যার ডালে ডালে পাখীরা বাসা নির্মাণ করে।

গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, তার পর হেমন্ত, তার পর শীত। বছরের চাকা এইভাবে ঘুরে চলে, কিন্তু কাকেদের জীবনে শীত-গ্রীষ্ম সমান, তারা দিন আনে, দিন খায়। রাত পোহালে গ্রামে ও শহরে যায় খাবারের খোঁজে, সন্ধ্যায় ফিরে আসে বাসায়।

তেপান্তরের মাঠে সেই কাকদের ছিল এক সর্দার। লঘুপতন তার নাম। একদিন ভোরবেলায় লঘুপতন দেখতে পেল, এক ব্যাধ এসে কিছু দূরে জাল পেতেছে। জাল পেতে তার উপর কিছু খাবার ছড়িয়ে দিয়ে ব্যাধ দূরে গিয়ে লুকিয়ে বসে রইল। তাই দেখে সর্দার-কাক লঘুপতন অন্য সব কাকদের ডেকে বলল, 'ভাই সব, আমাদের শত্রু এসে আজ ফাঁদ পেতেছে। দেখ, কত খাবার পড়ে আছে, কিন্তু নিশ্চয় জেনো, তার নীচে রয়েছে ব্যাধের জাল। যে লোভ করবে এই খাবারের জন্যে, সে-ই মরবে! আমি তোমাদের সাবধান করে দিলাম।'

কাকেরা বলল, 'না, না সর্দার, আমরা এই খাবারে লোভ করব না।'

এই বলে অন্য কাকেরা নানাদিকে উড়ে চলে গেল। কেবল সর্দার-কাক বসে বসে দুষ্ট ব্যাধের কথা ভাবতে লাগল।

এমন সময় আকাশে একঝাঁক পায়রা দেখা গেল। উড়তে উড়তে পায়রাগুলো এসে বসল সেই ব্যাধের ছড়ানো খাবারের উপর। বসবার সঙ্গে সঙ্গে তারা আটকে গেল জালে। পায়রারা যখন টের পেল যে,

তারা জালে আটকে গেছে, তখন তারা জাল থেকে মুক্তি পাবার জন্য হুটোপাটি লাগিয়ে দিল।

পায়রাদের সর্দার ধমক দিয়ে বলল, 'যারা বাঁচতে চাও, তারা আমার কথা শোন। যে যেভাবে আছ, সে সেইভাবেই স্থির হয়ে দাঁড়াও।'

পায়রাগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'সর্দার, আমাদের বাঁচাও।'

সর্দার-পায়রা বলল, 'আমরা ব্যাধের জালে জড়িয়ে পড়েছি। যত চেষ্টাই করি না কেন, মুক্ত হতে পারব না। এখন একটি উপায় আছে। যদি আমরা একসঙ্গে পাখা মেলে উড়ি, তবে জাল-সুদ্ধ উড়ে যেতে পারব। আমরা উড়ে যাব পাহাড়ের উপরে আমার বন্ধু হিরণ্যক নামে নেংটি ইঁদুরের কাছে। সে দাঁত দিয়ে জাল কেটে আমাদের বাঁচাবে। ঐ দেখ ব্যাধ আসছে, আর সময় নেই। এক—দুই—তিন—'

একঝাঁক পায়রা এক সঙ্গে জাল-সুদ্ধ উড়ে চলল। ব্যাধ বেচারা অবাক হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। এমন অদ্ভুত ব্যাপার সে আগে কখনও দেখে নি।

এদিকে সেই সর্দার-কাক লঘুপতন পায়রাদের কথা শুনে আর কাজ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। কেমন করে পায়রাগুলো মুক্তি পায়, তাই দেখবার জন্যে পায়রাদের পিছনে পিছনে সে-ও উড়ে চলল।

সর্দারের নির্দেশ-মত পায়রাগুলো হিরণ্যকের গর্তের কাছে নেমে পড়ল। সর্দার ডেকে বলল, 'ভাই হিরণ্যক, ঘরে আছ? আমাদের বাঁচাও। আমরা তোমার শরণাপন্ন।'

কিচির-মিচির করতে করতে হিরণ্যক বেরিয়ে এল। সে বলল, 'আরে দাদা যে! এ কী! এমন হল কী করে?'

সর্দার-পায়রা বলল, 'লোভ করতে গিয়ে, ভাই। এখন তুমি যদি বাঁচাও...'

হিরণ্যক বলল, 'অত করে বলতে হবে না, বন্ধু। আমার দ্বারা তোমার যদি উপকার হয়, তা নিশ্চয় করব। আর তোমার লোভ-টোভের কথা যা বললে, ও-সব কিছু নয়। সব দৈব। যা হবার তা হবেই।'

সর্দার-পায়রা বলল, 'এতগুলো খাবার একসঙ্গে পড়ে আছে দেখে আমাদের সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, তাই বলছিলাম লোভের জন্য ধরা পড়ে গেছি।'

হিরণ্যক বলল, 'দেখ বন্ধু, রামচন্দ্র ভগবানের অবতার ছিলেন, তিনি কি জানতেন না যে, সোনার হরিণ হয় না? অত বড় রাজা রাবণ কি জানতেন না যে, সীতাকে চুরি করলে পাপ হবে? ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কি জানতেন না যে, পাশাখেলায় অধর্ম হবে?...তাই বলি, যা হবার তা হবেই।'

এই বলে হিরণ্যক জালের কাছে এগিয়ে এসে সর্দারের বন্ধন মুক্ত করতে চাইল।

সর্দার বলল, 'না বন্ধু, আগে এদের মুক্ত কর, পরে আমার বন্ধন মুক্ত কোরো, এরা আমার অনুচর। যদি বন্ধন মুক্ত করতে করতে ব্যাধ এসে যায়, তবে এদের আর মুক্ত হওয়া হয়তো হবে না। সর্দার হয়ে নিজে কি করে আগে বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি! বিশেষতঃ এরা সব স্ত্রী-পুত্র রেখে আমার সঙ্গে এসেছে।'

হিরণ্যক বলল, 'রাজনীতি আমিও জানি, বন্ধু। শুধু তোমায় পরীক্ষা করছিলাম।'

এই বলে হিরণ্যক সকলের বন্ধন মুক্ত করে দিল। তারা হিরণ্যককে নমস্কার করে ও ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

দূর থেকে সর্দার-কাক লঘুপতন সবই লক্ষ্য করছিল। হিরণ্যকের কথাগুলো তার কাছে বড় ভালো লাগল। সে মনে মনে বলল, 'বন্ধু করতে হয় তো এমন লোককেই করতে হয়।'

পায়রাগুলো চলে যাবার পর লঘুপতন গিয়ে হিরণ্যককে ডাকতে লাগল। হিরণ্যক ভাবল, কে ডাকে? পায়রাদের আবার কোন বিপদ ঘটে নি তো? এই ভেবে সে তার গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেই ছুটে আবার গর্তে ঢুকে গেল। সাক্ষাৎ যমকে দেখে কে না ভয় পায়?

লঘুপতন বলল, 'বন্ধু হিরণ্যক, পায়রাদের সঙ্গে তোমার কথা-বার্তা শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই।'

হিরণ্যক॥ গর্তের ভিতর থেকে তোমার বন্ধুত্বকে নমস্কার করি। আমি খাদ্য, তুমি খাদক—বন্ধুত্ব হবে খুব চমৎকার! চালাকি করবার আর জায়গা পাও নি! কেটে পড় দেখি।

লঘুপতন॥ তোমার কথা শুনে বড় ব্যথা পেলাম, বন্ধু। কাক ইঁদুরের শত্রু, তাই বলে কি কোন দিন মিত্র হতে পারে না?

হিরণ্যক॥ না, কক্‌খনো না। দুর্জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে তার ফল শুভ হয় না। তা ছাড়া, কপট লোকেরা বন্ধুত্বের ছল করেই বেশি শত্রুতা করে। শোনা যায়, ইন্দ্র শপথ করেও বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন।

লঘুপতন॥ সবাই ইন্দ্রের মত না-ও হতে পারে।

হিরণ্যক॥ তা ঠিক। কিন্তু এ-সংসারে সাপ আর বেজি, জল আর আগুন, কুকুর আর বিড়াল, ধনী আর দরিদ্র, মূর্খ আর পণ্ডিত, সুজন আর দুর্জন পরস্পর শত্রু—জাত শত্রু।

লঘুপতন॥ মূর্খেরাই পরস্পর শত্রু হয়, পণ্ডিতেরা নয়। তোমার মত পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে কে শত্রুতা করবে?

হিরণ্যক॥ (মনে মনেঃ কথাটা ঠিকই বলেছে, তবু যাচাই করতে হবে) দেখ ভাই কাক, যার সঙ্গে পূর্বে শত্রুতা ছিল, পরে বন্ধুত্ব হয়েছে, তার পরিণাম ভালো হয় না। আবার কেউ যদি মনে করেন—আমি বিদ্বান ও পণ্ডিত, কেউ আমার সঙ্গে শত্রুতা করবে

না, তবে তিনি ভুল করবেন। কারণ, এরূপ শোনা যায়, ব্যাকরণের বিখ্যাত পণ্ডিত পাণিনিকে বধ করেছিল সিংহ, হাতী তার পায়ে পিষে দিয়েছিল মীমাংসাকার জৈমিনিকে, আর ছন্দোশাস্ত্রবিৎ পিঙ্গলকে কুমীরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

লঘুপতন॥ তুমি জ্ঞানী লোক, তোমার সঙ্গে যুক্তিতে আমি পারব কেন? তুমি যদি আমার বন্ধু হতে রাজী না হও, তবে আমি এইখানে বসে থেকেই প্রাণত্যাগ করব।

হিরণ্যক॥ (মনে মনেঃ এর সত্যি বন্ধুত্ব করার ইচ্ছা আছে) আচ্ছা, এক কাজ কর, ভাই কাক। রোজ একবার করে এস। দূরে থেকেই তোমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করব, কেমন?

লঘুপতন তাতেই রাজী হয়ে গেল।

তখন থেকে রোজ লঘুপতন কাক আর হিরণ্যক ইঁদুরে দেখা হয়, আলাপ হয়।

কয়েক মাস কেটে গেল। লঘুপতন আর হিরণ্যকের মধ্যে বন্ধুত্ব ক্রমে গভীর হয়ে এল। হিরণ্যক এখন আর লঘুপতনকে শত্রু বলে মনে করে না, বন্ধু বলে কাছে—খুব কাছে বসে গল্প করে।

দেখতে দেখতে এক বছর ঘুরে এল। লঘুপতনের ডানার মধ্যে গুটি-শুটি হয়ে বসে হিরণ্যক বলল, 'বন্ধু, আমাদের বন্ধুত্বের এক বছর হয়ে গেল!'

লঘুপতন বলল, 'বন্ধু হিরণ্যক, তোমার আমার বন্ধুত্ব সারা জীবন ধরে বেঁচে থাকবে।'

সেবার দেশে খুব দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। খাদ্যের এমন অভাব যে, না খেতে পেয়ে পশু-পাখীরা অবধি দেশ ছেড়ে পালাতে লাগল।

একদিন লঘুপতন এল হিরণ্যকের কাছে। বলল, 'বন্ধু হিরণ্যক,

ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। তাই ভাবছি, অন্য দেশে চলে যাব ; এখানে থাকলে না খেয়ে মরতে হবে।'

হিরণ্যক বলল, 'দুর্ভিক্ষের কথা ঠিকই বলেছ। কিন্তু বিদেশে যাওয়ার কল্পনা ত্যাগ কর। লোকে বলে—এ-সংসারে দানের তুল্য বস্তু নেই, লোভের চেয়ে শত্রু নেই, চরিত্রের সমান ভূষণ নেই, আর সন্তোষের সমান ধন নেই। দেশে যা আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাক। বিদেশে গিয়ে কাজ নেই।'

লঘুপতন বলল, 'ভাগ্য-অন্বেষণে বিদেশ যেতে দোষ কি? আমাকে যেতেই হবে, কিন্তু তোমায় ফেলে যেতে বড় কষ্ট হচ্ছে।'

হিরণ্যক বলল, 'কোথায় যাবে তুমি? আমাকেও নিয়ে চল না তোমার পিঠে করে?'

হিরণ্যকের কথা শুনে লঘুপতন মহাখুশী হয়ে বলল, 'বন্ধু, তোমার প্রস্তাব শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি। আমি তোমায় পিঠে করে অক্লেশে নিয়ে যাব। আমরা যাব আমার বন্ধু মন্থরক নামে কচ্ছপের দেশে। সে আমার অনেক কালের বন্ধু। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, সে তোমাকে দেখে খুব খুশী হবে।'

হিরণ্যককে পিঠে নিয়ে লঘুপতন মন্থরকের কাছে গেল।

মন্থরক তখন পড়ন্ত বেলায় রোদ পোহাচ্ছিল। একটা কাককে উড়ে আসতে দেখে সে হঠাৎ ভয় পেয়ে পুকুরের জলে ডুবে গেল। তখন লঘুপতন পুকুরের ধারে এসে ডাকতে লাগল, 'বন্ধু মন্থরক, আমি লঘুপতন এসেছি, কোন ভয় নেই, উঠে এস।'

লঘুপতনের কথা শুনে মন্থরক ভেসে উঠল। তার পর পাড়ে এসে লঘুপতনের কাছে বসেই বলল, 'চিনতে পারি নি দূর থেকে। কিছু মনে কোরো না, বন্ধু লঘুপতন। হঠাৎ কি মনে করে এলে? থাকবে তো এখানে কিছুদিন?'

লঘুপতন বলল, 'থাকবার জন্যেই তো এসেছি। আমাদের দেশে

বড় দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়েছে। তাই আমি আমার বন্ধু এই হিরণ্যককে নিয়ে তোমার কাছে চলে এসেছি।'

এতক্ষণ হিরণ্যকের দিকে নজর পড়ে নি মন্থরকের। এখন দেখে আশ্চর্য হয়ে বলল, 'ইনি তোমার বন্ধু? বাঃ, চমৎকার! কোথাও শুনি নি কাকের সঙ্গে ইঁদুরের বন্ধুত্ব হয়েছে! এখন দেখে বড় খুশী হলাম। আজ থেকে হিরণ্যক আমারও বন্ধু।'

হিরণ্যক খুশী হয়ে বলল, 'তোমার কথাবার্তায় বড় সন্তুষ্ট হয়েছি, বন্ধু। আমিও কি লঘুপতনের সঙ্গে তোমার কাছেই থাকতে পাব?'

মন্থরক বলল, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি থাকব এই পুকুরে, লঘু-পতন ঐ বড় গাছটায়, আর তুমি নূতন বন্ধু থাকবে গাছের তলায় গর্তে। তিন বন্ধুতে সুখে থাকব আমরা।'

লঘুপতন বলল, 'বন্ধু মন্থরক, আমাদের নূতন বন্ধু হিরণ্যক বড় পণ্ডিত। শাস্ত্রের কথা কত যে জানেন, তার লেখা-জোখা নেই। আজকাল ইনি বৈরাগ্যলাভ করেছেন।'

মন্থরক বলল, 'বন্ধু হিরণ্যক, তুমি তোমার বৈরাগ্যের কারণ আর তোমার অতীত জীবনের কথা কিছু কিছু বল, শুনি।'

তখন হিরণ্যক বলতে লাগলঃ

অনেক দিন আগেকার কথা।

মহিলারোপ্য নগরের প্রান্তে ছিল এক শিবমন্দির। তাম্রচূড় নামে এক সাধু ছিলেন সেই মন্দিরের পূজারী। তাম্রচূড় ভিক্ষা করে জীবিকানির্বাহ করতেন। তিনি ভিক্ষার চাল ভিক্ষাপাত্র-সুদ্ধ উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখতেন। পরদিন সকালে সেই চাল গরীব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিতেন। তার পর দেবমন্দির পরিষ্কার ও লেপন করে দিনের কাজ সুরু করতেন।

আমি অনেক বন্ধু-বান্ধব ও অনুচর নিয়ে মাটির তলায় এক সুন্দর দুর্গে বাস করতাম। একদিন অনুচর ইঁদুরেরা এসে আমায় বলল, 'প্রভু, তাম্রচূড় এত উঁচুতে ভিক্ষাপাত্র ঝুলিয়ে রাখে যে, আমরা শত চেষ্টা করেও নাগাল পাই না। ওখানে খাদ্য থাকতে আমরা অন্য জায়গায় যাব কেন? প্রভুর তো অগম্য স্থান নেই। আপনি যা হোক একটা উপায় করুন।'

সেই থেকে আমি রোজ রাত্রে গিয়ে তাম্রচূড়ের ভিক্ষার চাল খেয়ে আসতাম, আর অনুচরদের জন্য নীচে ফেলতাম। তাম্রচূড় কোন উপায় না দেখে একগাছা ভাঙ্গা লাঠি নিয়ে রাত্রে শুয়ে থাকতেন, আর আমার সাড়া পেলে লাঠির আঘাত করতেন।

একদিন তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে অন্য এক সাধু এসে শিবমন্দিরে আশ্রয় নিলেন। তাম্রচূড় তাঁকে উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে মন্দিরে বাস করতে অনুরোধ করলেন। তাম্রচূড়ের অনুরোধেই সেই আগন্তুক সাধু কয়েক দিনের জন্য মন্দিরে রয়ে গেলেন। রাত্রে কুশ-শয্যায় শুয়ে আগন্তুক সাধু ধর্ম-বিষয়ে নানা গল্প করতেন, আর তাম্রচূড় শুনতেন। কিন্তু তাম্রচূড়ের মন থাকত আমায় তাড়াবার দিকে। কাজেই অন্যমনস্ক হয়ে তিনি আগন্তুক সাধুর প্রশ্নের আবোল-তাবোল জবাব দিতে লাগলেন। আগন্তুক সাধু রেগে বললেন 'তাম্রচূড়, তুমি আমার প্রতি অমনোযোগী হয়ে আমায় অপমান করেছ।'

তাম্রচূড় বিনীতভাবে বললেন, 'আপনার প্রতি অন্যমনস্ক হওয়ার জন্যে আমি খুবই লজ্জিত। কিন্তু দেখুন এই ইঁদুরের কর্ম। রাতে আমি এর জ্বালায় ঘুমোতে পারি না। এত উঁচুতে ভিক্ষাপাত্র ঝুলিয়ে রাখি, কিন্তু এ-ইঁদুর কুকুর-বিড়ালকে হার মানিয়ে লাফ দেয়। ওরই জন্যে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।'

আগন্তুক সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'তাম্রচূড়, আমার মনে হয়, কোন রত্নের উপর এই ইঁদুরের বাসা। কেননা, ধন থেকে যে উষ্ণতা বা গর্ব জন্মে, তাতে প্রাণিগণের তেজ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দাতা হয়ে যে ধন ভোগ করে, সে-ই মহৎ। আরও এক কথা, যে লোভ করে, তার পরিণাম ভাল হয় না। 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' সম্পর্কে একটি গল্প বলছি, শোন।'

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু

একটা ব্যাধের ছেলে সারাদিন টো টো করে বনে বনে ঘুরে বেড়াল, কিন্তু কোন শিকারই পেল না।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে সে বড় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। তা ছাড়া, শিকার না পাওয়ায় তার মনোকষ্টও কম হয় নাই। অস্তগামী

সূর্যের দিকে চেয়ে সে আপন মনে বলল, 'বেলা আর নেই। এবার ঘরে ফিরি।'

এমন সময় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ছুটে এল এক বন্য শূকর। অতর্কিতে আক্রমণ করে ধারালো একটা দাঁত আমূল বসিয়ে দিল সেই ব্যাধের ছেলের দেহে। যন্ত্রণায় সে চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু একটা শূকরের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে রাজী ছিল না সে। দুপা পিছিয়ে গিয়ে চোখের নিমেষে সে একটা ভীষণ তীর ছুঁড়ল শূকরটাকে লক্ষ্য করে। গোঁ গোঁ চিৎকার করে শূকরটা মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে মারা গেল।

এদিকে ব্যাধের ছেলেও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। শূকরের ভীষণ দাঁতের আঘাতে তার গা থেকে অজস্র রক্ত ঝরতে লাগল। যন্ত্রণায় আর অবসাদে তার গা ঝিমঝিম করে উঠল, মাথা ঘুরে গেল। ধনুকে ভর দিয়ে সে মাটিতে শুয়ে পড়ল, আর উঠল না। সূর্য অস্ত গেল।

সন্ধ্যার পর এক খেঁকশিয়ালী ঘুরতে ঘুরতে এল সেই পথে। শূকর আর ব্যাধের ছেলেকে মরে পড়ে থাকতে দেখে তার কী আনন্দ! আনন্দে ধেই ধেই করে সে নাচতে লাগল। সে বলল. 'মেঘ না চাইতে জল! কদিন থেকে না খেতে পেয়ে কী কষ্টই না পাচ্ছিলাম! এবার ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন!'

আনন্দের আতিশয্যে সেই খেঁকশিয়ালী একবার শূকরকে, একবার ব্যাধের ছেলেকে, আর একবার চামড়ায় তৈরি ধনুকের ছিলাটাকে শুঁকতে লাগল। লোভে তার জিভে লালা গড়াচ্ছে। সে মনে মনে বলল, 'আহা, অনেকদিন ধরে আমি এদের খাব, একটু একটু করে খাব। ভাগ দেব না কাউকে।...আজ কোন্‌টাকে খাই? মানুষটাকে?—না, ওর নরম মাংস কাল সকালে খাব আরাম করে। শূকরটাকেই খাই আজ রাতে। শূকরটাকে খাব? না, ওর চামড়া

বড় শক্ত, রাতে ছিঁড়তে পারা যাবে না। তা ছাড়া, রাতে আমার ক্ষিদেও বেশি নেই। অতএব হরিণের চামড়ায় তৈরী ধনুকের ছিলাটাই খাই। কী সুন্দর ওর গন্ধ!

আপন মনে যুক্তি-বিবেচনা করে খেঁকশিয়ালী ছিলাটাই খাবে বলে ঠিক করল। প্রথমে সে ছিলাটা চাটতে লাগল। তারপর কামড়াতে লাগল। এক কামড়, দু'কামড়...পট্ পট্ করে ছিলাটা ছিঁড়ে গেল। আর প্রকাণ্ড ধনুকটা ছিলামুক্ত হয়ে ছিট্‌কে গিয়ে খেঁকশিয়ালীর বুকে বিঁধল, তার খাওয়া জন্মের মত ঘুচে গেল।

গল্প শেষ করে সেই আগন্তুক সাধু বলল, 'তাম্রচূড়, তুমি জান কোন্ পথে এই ইঁদুর যাতায়াত করে? কোথায় এর বাসস্থান?'

তাম্রচূড় বললেন, 'না, আমি ঠিক জানি না। তবে এই সর্দার-ইঁদুরটা একলা আসে না। সঙ্গে অনেক অনুচর নিয়ে আসে। আর আমায় মোটেই গ্রাহ্য করে না।'

তখন তাম্রচূড় আর সেই সাধু মিলে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে আমার দুর্গের দিকে এল। আমি বিপদ বুঝে অনুচরদের নিয়ে অন্যপথ ধরলাম। কিন্তু বিপদ কখনও একা আসে না। কিছুদূর গিয়েই এক হিংস্র বিড়ালের সামনে পড়ে গেলাম। সেই বিড়াল আমার অনুচরদের অনেককে ধরে খেয়ে ফেলল। ওদিকে সেই সাধু দু'জন আমার দুর্গের তলা থেকে মূল্যবান রত্নখানি তুলে নিয়ে গেলেন।

অবশিষ্ট ইঁদুরদের নিয়ে আমি সেই রাতে আবার গেলাম মন্দিরে। আমি তাম্রচূড়ের ভিক্ষাপাত্রে উঠবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও পারলাম না। তাম্রচূড় স্বভাববশতঃ তেমনি লাঠি দিয়ে কিছুক্ষণ পর পর শব্দ করতে লাগলেন।

আগন্তুক সাধু বললেন, 'তাম্রচূড়, তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ। সেই

ইঁদুরের আজ আর কোন ক্ষমতা নেই। কারণ, রত্নটি এখন আমার বালিশের নীচে। রত্নের জন্যই ইঁদুরটির এত শক্তি ছিল। আজ আর তার তেমন শক্তি নেই যে, সে ভিক্ষাপাত্রে লাফিয়ে উঠবে।'

আমি বিফল হয়ে ফিরে এলাম। আমার অনুচরেরা বলাবলি করল, 'আমাদের দলপতি হিরণ্যকের এখন আর এমন ক্ষমতা নেই যে, তিনি আমাদের খাওয়াতে পারেন। অতএব চল আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।'

এই বলে তারা আমায় ত্যাগ করে চলে গেল। আমি ভাবলাম, ধিক্ আমার দারিদ্র্যে! ধনহীন পুরুষ, ব্রাহ্মণ-বর্জিত শ্রাদ্ধ ও দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ মৃত, অর্থাৎ এদের কোন মূল্যই নাই।

পরদিন রাতে আমি আবার সেই মন্দিরে গেলাম। রত্নের অভাবেই আমার এই দুর্দশা, অতএব যে করেই পারি, রত্নটি নিয়ে আসব—এই ছিল ইচ্ছা। চতুর তাম্রচূড় আমার আগমন টের পেয়ে লাঠির এক প্রচণ্ড আঘাত করল আমার মাথায়।

আয়ুর জোরে বেঁচে গেলাম আমি।

আমি অর্থের জন্য শোক করি না, কিন্তু কেমন করে অর্থ নষ্ট হল আর কি জন্যই বা অর্থ পেলাম না, তা-ও তো ভুলতে পারি না! তবে এ-কথাও ঠিক যে, যা আমার, তা আমারই, অপরের নয়।

নিজের অতীত ঘটনার গল্প শেষ করে হিরণ্যক বলল, 'বুঝলে বন্ধুগণ, এই আমার বৈরাগ্যের কারণ।'

মন্থরক বলল, 'বন্ধু হিরণ্যক, তুমি ঠিকই বলেছ। যা কপালে নেই, তা হবার নয়। তা ছাড়া, যে-ধন তুমি ভোগ করতে না, সে-ধনে তোমার কি প্রয়োজন ? সোমিলক টাকা পেয়েও তা রাখতে পারে নি।'

হিরণ্যক জিজ্ঞাসা করল, 'কেন টাকা রাখতে পারে নি সোমিলক ?'

তখন মন্থরক বলতে লাগল 'সোমিলকের কাহিনী'।

সোমিলকের কাহিনী

সুন্দর কাপড় তৈরী করত সোমিলক। তার মত নিখুঁত তাঁত চালাতে আর মিহি কাপড় তৈরী করতে সে অঞ্চলে আর কেউ পারত না।

কিন্তু মিহি কাপড়ের চাহিদা ছিল কম—কাজেই সোমিলকের আর অভাব ঘোচে না। তার ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না।

একদিন সোমিলক বলল, 'গিন্নী, আমি বিদেশে যাব। বিদেশে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করব।'

গিন্নী বলল, 'পাগলামি রাখ। কপালে না থাকলে কি আর বিদেশে গেলেই রোজগার হবে?'

সোমিলক বলল, 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী কি আর শাস্ত্রে বলে সাধে? দেখ গিন্নী, উদ্যোগী পুরুষেরাই লক্ষ্মীকে পেয়ে থাকে। যা হবার হবে বলে যারা বসে থাকে, তাদের কিছুই হয় না।'

গিন্নী বলল, 'বেশ, দেখ চেষ্টা করে।'

বিদেশে সোমিলকের কাপড়ের চাহিদা হল খুব। তাই এক বছরে সোমিলক তিনশ মোহর লাভ করল। তার পর সেই মোহর নিয়ে চলল নিজের দেশে। পথে চলতে চলতে সোমিলক ভাবল, মোহরগুলো গিন্নীর কাছে রেখে আবার আসব বিদেশে। আবার ব্যবসায়ে লাভ করে গিন্নীর কাছে মোহর নিয়ে যাব। এইভাবে বেড়ে চলবে আমার সঞ্চয়। সঞ্চয়ের কথা ভাবতে ভাবতে সোমিলক পথ চলতে লাগল। সে লক্ষ্য করে নি কখন সন্ধ্যা উত্‌রে গেছে। যখন তার খেয়াল হল, সে ভাবল, তাই তো, সামনেই মস্ত বন! এতগুলো মোহর নিয়ে এখন কোথায় যাই? দস্যুর ভয় আছে, তার চেয়েও বেশি ভয় বাঘ-ভালুকের। অনেক ভেবে সোমিলক একটা উঁচু গাছের উপর চড়ে বসল। রাতটা সে গাছে বসেই কাটিয়ে দেবে।

গাছে বসে কি আর ঘুমান যায়? তবু পথ চলার পরিশ্রমে কখন সোমিলকের দুচোখ বুজে এল। কাক-পক্ষী জাগবার আগে সোমিলকের ঘুম ভেঙে গেল। স্বভাববশতঃ কোমরে মোহরের থলেটাতে হাত দিয়েই সে হায় হায় করে উঠল। সে কাঁদতে লাগল,

আমার মোহরগুলি কোথায় গেল? কে চুরি করল আমার রক্ত-জল-করা মোহরগুলো? সোমিলক কোন সদুত্তর পেল না।

মোহর-হারানোর দুঃখে সোমিলক একেবারে যেন ভেঙে পড়ল। মাথায় হাত দিয়ে সে বসে রইল অনেকক্ষণ। তার পর উঠে দাঁড়াল। সে মনে মনে বলল, 'আবার বিদেশে যাব। আবার মোহর লাভ করব, তবে ফিরব দেশে।'

আবার এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করল সোমিলক। শ্রমের উপযুক্ত মূল্যও সে পেল। এক বছরে পাঁচশ মোহর লাভ করে সোমিলক নিজের দেশে ফিরে চলল। এবার সে বনের পথ দিয়ে গেল না। গাছে বসে রাত কাটাতেও গেল না সে।

মোহরগুলো কোমরে জড়িয়ে সোমিলক পথ চলতে লাগল। রাত হলে সে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। দিনের বেলায় পথ চলে।

একদিন চলতে চলতে সোমিলক দেখতে পেল, যেন তার আগে আগে দুজন লোক যাচ্ছে। তাদের স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু কথাগুলো শোনা যাচ্ছে। সোমিলক এদেরই চোর মনে করে জোর করে চেপে ধরে রাখল মোহরের থলেটাকে।

সেই দুজন লোকের একজন কর্মপুরুষ, অপরজন ভাগ্যপুরুষ। কর্মপুরুষ কর্মের পুরস্কার দেন, আর ভাগ্যপুরুষ যার ভাগ্যে যতটুকু আছে, তাই দেন—বেশি হলে কেড়ে নেন, কম হলে পাইয়ে দেন। সোমিলক শুনতে পেল ভাগ্যপুরুষ বলছেন, 'ওহে কর্মপুরুষ, আপনি সোমিলককে এত মোহর দিলেন কেন? যে-ধন সে ভোগ করে না, তাতে তার অধিকার নেই।'

কর্মপুরুষ বললেন, 'ভাগ্যপুরুষ, কর্মীকে আমি কর্মের পুরস্কার নিশ্চয়ই দেব। ভোগ করা না করা তার হাতে।'

এঁদের কথা শুনে সোমিলক ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল। তার মনে

হল, কে যেন তার থলে থেকে মোহরগুলো বার করে নিচ্ছে। সোমিলক চেঁচিয়ে উঠল, 'চোর, চোর' বলে। তার পর থলেটা খুলে দেখল, তার মধ্যে মাত্র পঞ্চাশটি মোহর পড়ে রয়েছে, সাড়ে চার শ মোহর খোয়া গেছে। তখন ভাগ্যপুরুষ দেখা দিয়ে বললেন, 'সোমিলক, সংসার চালাবার পর যে-অর্থ তুমি দেশে নিয়ে যাচ্ছিলে, তা কেবল সঞ্চয় করবার জন্য। সেই সঞ্চয়ে তোমার কোন উপকার নেই, অপরেরও নেই। যে অর্থ ভোগ করবে না, দান করবে না, তেমন অর্থে তোমার কোন অধিকার নেই ভেবে আমি তা নিয়ে নিলাম। দুঃখ কোরো না। তুমি বর্ধমানে যাও, সেখানে গুপ্তধন আর উপ-ভুক্তধন নামে দুই ভদ্রলোক আছেন। তুমি তাঁদের সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। তোমার দুঃখ দূর হয়ে যাবে।'

বর্ধমান শহরে গুপ্তধনকে খুঁজে বার করা কঠিন হল না সোমিলকের পক্ষে। একদিন সন্ধ্যায় সোমিলক গিয়ে গুপ্তধনের সঙ্গে দেখা করল। সোমিলক বলল, 'মহাশয়, আমি বিদেশী। ক্ষুধায় ও পথশ্রমে আমি ক্লান্ত। তা ছাড়া, সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমার দেহ আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। দয়া করে আজ রাতে আপনার গৃহে আশ্রয় দিয়ে আমায় বাঁচান।'

গুপ্তধন বলল, 'আমি অতিথি পছন্দ করি না। তুমি অন্যপথ দেখ।'

সোমিলক বলল, 'এই ঝড়-বাদলের দিনে কোথায় যাব? আমি বিদেশী, এ-শহরে কে আমায় স্থান দেবে?'

কথাবার্তা শুনে গুপ্তধনের স্ত্রী এগিয়ে এল। সে বলল, 'আমরা স্থান দিতে পারব না। কে না কে লোক, তার ঠিক নেই। তা ছাড়া, আমাদের রান্না-বান্নাও হয়ে গেছে। কে যাবে বাপু, এই ঝড়-বাদলের রাতে নতুন করে রাঁধতে?

নিরুপায় সোমিলক বলল, 'যা হোক কিছু খেতে দেবেন। আর একটু শোবার জায়গা দেবেন। তাতেই যথেষ্ট।'

গুপ্তধন আর তার স্ত্রী অগত্যা সোমিলককে স্থান দিল। বাসি ভাত আর নুন দেওয়া হল সোমিলককে খেতে, আর গোয়ালের খড়ের গাদায় তাকে দেওয়া হল শুতে। বেচারী সোমিলক কিছুমাত্র আপত্তি না করে খেয়ে দেয়ে শুয়ে শুয়ে গুপ্তধনের কথাই ভাবতে লাগল। গুপ্তধন ধনবান লোক, অথচ অতিথির জন্য একটা পয়সা খরচ করে না!

সোমিলক ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ কান্নাকাটির শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। সোমিলক খবর নিয়ে জানতে পারল যে, গুপ্তধনের স্ত্রীর ভেদ-বমি হচ্ছে, বদ্যি এসে চিকিৎসা করেও রোগ সারাতে পারছেন না। ভোর হতে না হতেই সোমিলক গুপ্তধনের বাড়ী থেকে চলে গেল।

গুপ্তধনের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে সোমিলক সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিল। সারাদিন ধরে খুঁজে খুঁজে সে উপভুক্তধনের বাড়ী গিয়ে পেঁছিল ঠিক সন্ধ্যাবেলায়। সোমিলক গৃহকর্তা উপভুক্তধনকে বলল, 'মহাশয়, আমি বিদেশী লোক। বহু পথ ঘুরে ঘুরে আপনার কাছে এসেছি। আজ রাতে আপনার আশ্রয়ে থাকতে চাই।'

উপভুক্তধন খুশী হয়ে বলল, 'কী সৌভাগ্য আমার! আসুন, ঘরে আসুন। বিদেশী অতিথি, বিশেষতঃ যিনি সন্ধ্যায় আসেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ অতিথি। আজ আমাদের কী সৌভাগ্য যে, আপনার মত অতিথি পেয়েছি! আপনি বসুন, আমি গিন্নীকে খবর দিই।'

একদমে এতগুলো কথা বলে উপভুক্তধন 'গিন্নী গিন্নী' বলে ডাকতে ডাকতে বাড়ীর ভিতরে গেল।

সোমিলক চারদিকে চেয়ে ভাবল, অবস্থা দেখে মনে হয় যে, এরা গরীব, অথচ অতিথির জন্য নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছে!

সোমিলক একা-একা বসে এই সব ভাবছে, এমন সময় উপভুক্তধনের স্ত্রী এসে তাকে নমস্কার করে বলল, 'অতিথি সাক্ষাৎ নারায়ণ। অতএব হে অতিথি, আপনি আজ রাতে এখানেই আশ্রয় লাভ করুন। আপনার পা ধোবার জল নিয়ে আসছি। আপনি বিশ্রাম করুন। আপনার আহারের ব্যবস্থা করছি।'

উপভুক্তধনের নিরাভরণা স্ত্রীকে দেখে সোমিলক মুগ্ধ হয়ে গেল। তার মনে হল, যেন স্বয়ং লক্ষ্মী বা অন্নপূর্ণা তার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন!

অনেক রকমের অন্ন-ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা হয়েছিল সোমিলকের জন্য। সোমিলক জীবনে এত সুখাদ্য খায় নি, এমন যত্ন করেও কেউ তাকে খাওয়ায় নি। তবু খেতে বসে সোমিলকের কেবলি মনে হচ্ছিল, এঁদের অবস্থা তো ভাল নয়। আমার মত অতিথির জন্য এত বন্দোবস্ত না করলেও চলত।

রাতে সোমিলকের গভীর নিদ্রা হল। ঘুম থেকে উঠতে বেশ একটু বেলাই হয়ে গেল। সোমিলক ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই উপভুক্তধনের স্ত্রী এসে তার মুখ ধোবার জল দিয়ে গেল। বলে গেল, 'কাল রাতে আপনার জন্য ভাল খাবার যোগাড় করতে পারি নি, ভাল বিছানাও দিতে পারি নি। হয়তো রাতে ভাল ঘুম হয় নি আপনার। আমি অনুরোধ করছি, আজকের দিনটাও থেকে যান আমাদের ঘরে।'

সোমিলক বিনীতভাবে বলল, 'কাল রাতে যা খেয়েছি, তেমন সুখাদ্য ও তৃপ্তিকর খাদ্য আমি জীবনে কখনও খাই নি। কাল রাতে যেমন ঘুমিয়েছি, অনেক দিন তেমন ঘুমাই নি। আপনাদের কোন ত্রুটিই হয় নি, বরং অসময়ে এসে আপনাদেরই বিরক্ত করেছি আমি।'

সেই অতিথিপরায়ণা স্ত্রীলোকটি বলল, 'এমন কথা বললে আমাদের পাপ হবে। আপনি মুখ-হাত ধোন, আমি খাবার নিয়ে আসি।'

গৃহকর্ত্রী চলে গেলে সোমিলক শুনতে পেল, গৃহস্বামী উপভুক্তধন যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। কে যেন বলছে, 'মহাশয়, আপনার কাছে অনেক টাকা পাব। মাসের পর মাস আপনি ধারে জিনিসপত্র এনেছেন। তার উপর অতিথির নাম করে কাল রাতেও অনেক টাকার জিনিস এনেছেন। আপনার তো অতিথিসেবা লেগেই আছে। তা থাক। কিন্তু আমি আর ধারে জিনিস দিতে পারব না।'

উপভুক্তধন বলছে, 'আস্তে কথা কও, ভাই। ঘরে অতিথি ঘুমিয়ে রয়েছেন, শুনতে পেলে লজ্জার সীমা থাকবে না। দেখ ভাই, আমার এই সামান্য বাস্তুভিটা বন্ধক রাখতে পারি তোমার কাছে। তুমি তা-ই নাও। কিন্তু আমার অতিথিকে যেন বিমুখ করতে না হয়। কাল রাতে কী বা করতে পেরেছি তাঁর জন্যে!'

এদের কথা শুনতে পেয়ে সোমিলকের লজ্জার সীমা রইল না। সে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলল, 'ছিঃ, এঁদের এই দুরবস্থা! আমি থাকলে এঁদের ঋণের বোঝা বেড়ে যাবে আরও।'

উপভুক্তধন ও তার স্ত্রীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে সোমিলক পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পাছে কেউ দেখতে পায়, এই ভয়ে সোমিলক জোরে পা চালিয়ে দিল।

সোমিলক মাত্র কিছুদূর গিয়েছে, এমন সময় ঝাঁকা মাথায় পাঁচ-ছ'জন লোক এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মহাশয়, উপভুক্তধনের বাড়ি কোথায় বলতে পারেন? রাজা তাঁকে একমাসের বরাদ্দ চাল-ডাল-আটা-ঘি পাঠিয়েছেন।'

সোমিলক বিস্মিত হয়ে আঙুল দিয়ে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বলতে পার, কেন এসব পাঠান হয়েছে?'

সেই লোকেরা বলল, 'শহরের সজ্জনদের জন্য রাজা মাসে মাসে কিছু বরাদ্দ পাঠিয়ে থাকেন। এ-মাসের বরাদ্দ পেয়েছেন উপভুক্তধন।'

ভাবতে ভাবতে সোমিলক আরও খানিকটা পথ হে'টে গেল। এমন সময় সেই কর্মপুরুষ আর ভাগ্যপুরুষ দেখা দিয়ে বললেন, 'সোমিলক, কী শিক্ষা পেলে ?'

সোমিলক বলল, 'দানের মত বস্তু আর সংসারে নেই। তা ছাড়া, অর্থ সঞ্চয় করার চেয়ে খরচ করা ভালো।'

ভাগ্যপুরুষ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ধন পেলে তুমি কি করবে ?'

সোমিলক উত্তর দিল, 'দান করব, আর ভোগ করব।'

ভাগ্যপুরুষ বললেন, 'এই নাও তোমার মোহরগুলো।'

গল্প শেষ করে মন্থরক বলল, 'বন্ধু হিরণ্যক, তুমি ধনের জন্য শোক করো না। ধন থাকলেও তা যদি ভোগ করতে না পারা যায়, তবে সে-ধনে প্রয়োজন কি? দেখ, ধনের তিনরকম গতি হয়—দান, ভোগ আর ক্ষতি। যিনি দান করেন না, বা ভোগ করেন না, তাঁর ধনের শেষ গতি অর্থাৎ ক্ষতি হয়। এ-সংসারে দানের মত ধর্ম নেই, সন্তুষ্ট থাকার মত সুখও নেই।'

হিরণ্যক বলল, 'বন্ধু, তোমার কথা শুনে মনে সান্ত্বনা পেলাম।'

হিরণ্যকের কথা শেষ হতে না হতেই কিসের একটা শব্দ শুনে তিনবন্ধু চেয়ে দেখল, একটা হরিণ ছুটতে ছুটতে আসছে। হরিণটা এসে তাদেরই কাছে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। তা দেখে লঘুপতন, হিরণ্যক আর মন্থরক বলাবলি করল, 'এ-হরিণ নিশ্চয় ভয় পেয়ে ছুটে এসেছে। আমাদের উচিত একে অভয় দেওয়া।'

লঘুপতন হরিণকে ডেকে বলল, 'কী হয়েছে ভাই, হরিণ? অত হাঁপাচ্ছ কেন ?'

হরিণ বলল, 'প্রাণে বে'চে গেছি, এই ভাগ্য! কোথা থেকে একদল ব্যাধ এসে আমাকে আক্রমণ করেছিল। আমি কোনরকমে পালিয়ে এসেছি। সঙ্গীদের কী হয়েছে, কে জানে!'

লঘুপতন বলল, 'আমি দেখেছি, ব্যাধেরা কতকগুলো হরিণ মেরে গাঁয়ের দিকে চলে গেছে।'

—'চলে গেছে? বাঁচা গেল।' হরিণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

মন্থরক বলল, 'ভালোই হয়েছে। আজ থেকে তুমিও আমাদের বন্ধু হলে। ঐখানে ঝোপটার মধ্যে তুমি থাকবে। আমরা চার বন্ধু মিলে সুখে বাস করব। তোমার নাম কি বন্ধু, কি বলে তোমায় ডাকব?'

হিরণ্যক বলল, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। আমরা চার বন্ধু একমন একপ্রাণ!'

হরিণ বলল, 'বন্ধুগণ, তোমাদের ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আজ থেকে আমিও তোমাদের বন্ধু বলেই মনে করব, আর তোমাদের কাছেই থাকব। আমার নাম চিত্রাঙ্গ। চিত্রাঙ্গ বলেই ডাকবে আমায়।'

সেই থেকে লঘুপতন, হিরণ্যক, মন্থরক আর চিত্রাঙ্গ এক সঙ্গে সুখে বাস করে, খায়-দায় আর গল্পগুজব করে দিন কাটায়।

কিছুদিন পরের কথা।

একদিন ভোরবেলায় চিত্রাঙ্গ গিয়েছিল দূর বনে কচি ঘাসের সন্ধানে। কথা ছিল, দুপুরের মধ্যেই সে ফিরে আসবে। দুপুর গড়িয়ে ক্রমে বিকাল হতে চলল, কিন্তু চিত্রাঙ্গের দেখা নেই! তিন বন্ধু হরিণের জন্য বড় ভাবনায় পড়ে গেল। হিরণ্যক আর মন্থরক বলল, 'আমাদের ভয় হচ্ছে, হয়তো তার কোন বিপদ ঘটেছে।'

অবশেষে লঘুপতন বলল, 'আর অপেক্ষা না করে আমি উড়ে গিয়ে খুঁজে আসি। দেখি কোন খবর পাওয়া যায় কিনা।'

এই বলে কাক উড়ে গেল।

কা কা করে হরিণ-বন্ধুকে ডাকতে ডাকতে কাক উড়ে চলল। হঠাৎ সে দেখতে পেল তাদের বন্ধুকে, এ কী অবস্থা হয়েছে বন্ধুর!

চিত্রাঙ্গের অবস্থা দেখে লঘুপতনের চোখে এল জল। সে গিয়ে মুখের কাছে বসে বলল, 'বন্ধু, এ কী হল!'

কাককে দেখতে পেয়ে চিত্রাঙ্গ বলল, 'তোমায় দেখে বড় খুশী হলাম, বন্ধু লঘুপতন। দেখ, ব্যাধের জালে যেভাবে আটকে গেছি, তা থেকে মুক্ত হওয়া অসাধ্য। ব্যাধ এখনি এসে আমায় মেরে ফেলবে। মরবার সময়ে বন্ধুর মুখ দেখে মরতে পারব—এই সান্ত্বনা।'

লঘুপতন বলল, 'এমন কথা মুখে এনো না, বন্ধু। আমি এখনি গিয়ে হিরণ্যককে নিয়ে আসব। সে জাল কেটে তোমায় রক্ষা করবে।'

চিত্রাঙ্গ বলল, 'ব্যাধ এখনি এসে যাবে। কাজেই সে চেষ্টা করে লাভ নেই, তাতে বরং তোমাদের বিপদের আশঙ্কা আছে। তুমি যাও বন্ধু, গিয়ে হিরণ্যক আর মন্থরককে আমার ভালোবাসার কথা জানিও। তাদের মনে কোন দিন যদি কোন ব্যথা দিয়ে থাকি, তবে যেন তারা আমাকে ক্ষমা করে।'

চিত্রাঙ্গের কথা শেষ হতে না হতেই চিক্ চিক্ শব্দ শুনে লঘু-পতন দেখল, হিরণ্যক চলে এসেছে। সে বলল, 'এই যে, বলতে বলতেই হিরণ্যক এসে গেছে।'

হিরণ্যক এসে বলল, 'মনটা বড় খারাপ লাগছিল বন্ধুর জন্যে, তাই মন্থরককে রেখে চলে এলাম।...কোন ভয় নেই, বন্ধু চিত্রাঙ্গ। এই দেখ না, আমি কেমন জাল কেটে দিচ্ছি!'

এই বলেই হিরণ্যক গিয়ে জাল কেটে চিত্রাঙ্গকে মুক্ত করে দিল।

এমন সময় থপ্ থপ্ করতে করতে মন্থরক এসে হাজির হল। সে বলল, 'তোমাদের ফিরতে বিলম্ব দেখে আমিও আর থাকতে পারলাম না। চলে এসেছি তাই।'

চিত্রাঙ্গ বলল, 'বন্ধু মন্থরক, তোমাদের জন্যই এযাত্রা বেঁচে গেলাম। সারাদিন জালে আটকা পড়ে কেবল তোমাদের কথাই ভাব-

ছিলাম। কিন্তু তুমি এসে তো ভাল কর নি! যদি ব্যাধেরা এসে পড়ে? তুমি তো আমাদের মত ছুটতে পারবে না।'

হিরণ্যক বলল, 'আর দেরি করা নয়। ঘরের দিকে চল। বন্ধু লঘুপতন, একবার উপরে উঠে দেখ তো কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা।'

হিরণ্যকের কথামত লঘুপতন গিয়ে একটা গাছের উঁচু ডালে বসে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'পালাও, পালাও, ব্যাধ আসছে।'

বিপদের কথা শুনে হিরণ্যক একটা গর্তে ঢুকে পড়ল, চিত্রাঙ্গ ছুটে পালাল একটা বনের দিকে, মন্থরক নিরুপায় হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ছুটতে গেলেই তার বিপদ বরং বেশি।

হরিণটাকে ছুটে পালাতে দেখে ব্যাধ দৌড়ে এল। কিন্তু হরিণের নাগাল সে পেল না। হঠাৎ ব্যাধের নজরে পড়ল মন্থরক। সে মনে মনে বলল, 'যা হোক, হরিণের বদলে একটা কচ্ছপ পাওয়া গেল।'

কচ্ছপটাকেই সে বেঁধে নিয়ে চলল।

গাছের ডালপালার ফাঁকে বসে লঘুপতন সবই দেখছিল। সে ভাবল, হায় কি করা যায়? কেমন করে মন্থরককে বাঁচাই? এমন সময়ে চিত্রাঙ্গ আর হিরণ্যক ফিরে এল। তারা জিজ্ঞাসা করল, 'মন্থরক কোথায়? তাকে তো দেখছি না?'

—'ব্যাধ তাকে ধরে নিয়ে গেছে!'

হরিণ আর হিরণ্যকের চোখে এল জল। লঘুপতন বলল, 'কাঁদলে চলবে না, বন্ধুগণ, একটা উপায় বার করতে হবে। তোমরা যদি রাজী থাক, তবে আমি একটা উপায় বলতে পারি। চল, সেই মত কাজ করে দেখি।'

লঘুপতনের পরামর্শমত চিত্রাঙ্গ ছুটে গিয়ে ব্যাধের পথের ধারে

দম বন্ধ করে পেট ফুলিয়ে মরার মত পড়ে রইল। লঘুপতন তার উপরে বসে ঠোকরাতে লাগল—ঠিক যেন একটা মরা হরিণ।

কচ্ছপটাকে নিয়ে যেতে যেতে ব্যাধ দেখল, আরে ঐ যে একটা হরিণ মরে পড়ে রয়েছে! নিশ্চয়ই সেই হরিণটা জাল ছিঁড়ে পালাতে গিয়ে পড়ে মরে গেছে। ব্যাধ খুশী হয়ে নিজের মনে বলল, ভালোই হল, একটা কচ্ছপ পেয়েছি, একটা হরিণও পাব এখুনি। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সে কচ্ছপটাকে মাটিতে রেখে গেল হরিণটাকে নিয়ে আসতে।

এদিকে ব্যাধের পিছনে পিছনে আসছিল হিরণ্যক। যেই মাত্র মন্থরককে মাটিতে রেখে ব্যাধ চিত্রাঙ্গের দিকে গেল, অমনি হিরণ্যক এসে মন্থরকের বাঁধন কেটে দিল। হিরণ্যক বলল, 'বন্ধু মন্থরক, ঐ দেখ একটা ডোবা, বিলম্ব না করে তুমি ডোবাতে গিয়ে লুকিয়ে থাক। ব্যাধ চলে গেলে আমরা তোমায় ডেকে নেব।'

ভয়ে হাত পা কাঁপছিল মন্থরকের, তবু প্রাণের দায়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে সে ডোবার জলে ডুবে রইল। হিরণ্যকও কাছেই গা-ঢাকা দিয়ে রইল।

ও-দিকে ব্যাধ চিত্রাঙ্গের কাছাকাছি গেলে, লঘুপতন বলল, 'বন্ধু, তৈরী হয়ে থাক। হিরণ্যক খুলে দিয়েছে মন্থরকের বাঁধন। তাকে দেখলাম, ডোবার দিকে যেতে। ব্যাধ তোমার দিকে আসছে। আর দেরি নয়—কা কা কা'...

কাক উড়ে গেল। নিমেষে উঠে হরিণ এমন ছুট দিল যে, ব্যাধ অবাক হয়ে বোকার মত চেয়ে রইল। সে নিজের মনেই বলল, 'আজকাল হরিণগুলো যা চালাক হয়েছে, ওদের ধরা যাবে না! যাক, কচ্ছপটাকে খেয়েই আজকের দিনটা কাটিয়ে দেব।'

কিন্তু ব্যাধের কপাল সেদিন ছিল বড় মন্দ। ফিরে এসে সে দেখল—কেবল জালটা পড়ে আছে, কচ্ছপটা নেই! হতাশ হয়ে সে এই বলতে বলতে চলে গেল—হাতের কচ্ছপটাকে রেখে কেন আমি মরা হরিণটাকে আনতে গেলাম!

ব্যাধ চলে গেল। লঘুপতনের সংকেতে চারবন্ধু এসে জড়ো হল। হরিণ ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল, হিরণ্যক গর্ত থেকে, আর মন্থরক ডোবার জল থেকে।

হিরণ্যক বলল, 'বোকা ব্যাধটাকে বড় ঠকিয়েছি আমরা!'

চিত্রাঙ্গ বলল, 'আমাদের বন্ধু লঘুপতনের বুদ্ধি আর কৌশলে আমরা বেঁচে গেছি, তাকে ধন্যবাদ।'

লঘুপতন বলল, 'ধন্যবাদ আমার একার প্রাপ্য নয়—ধন্যবাদ আমাদের খাঁটি বন্ধুত্বকে, ধন্যবাদ আমাদের একতাকে, ধন্যবাদ আমাদের চারবন্ধুকে।'

সেই থেকে চারবন্ধু মনের সুখে বাস করতে লাগল।

এর পরে আরম্ভ হল তৃতীয় তন্ত্রের 'কাকোলূকীয়' অর্থাৎ কাক আর পেঁচার কাহিনী।

॥ দ্বিতীয় তন্ত্র সমাপ্ত ॥
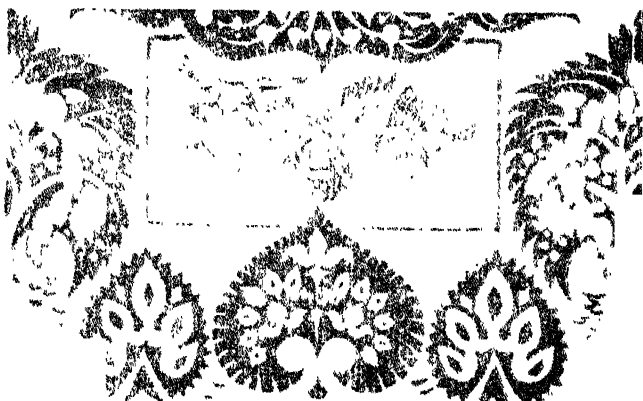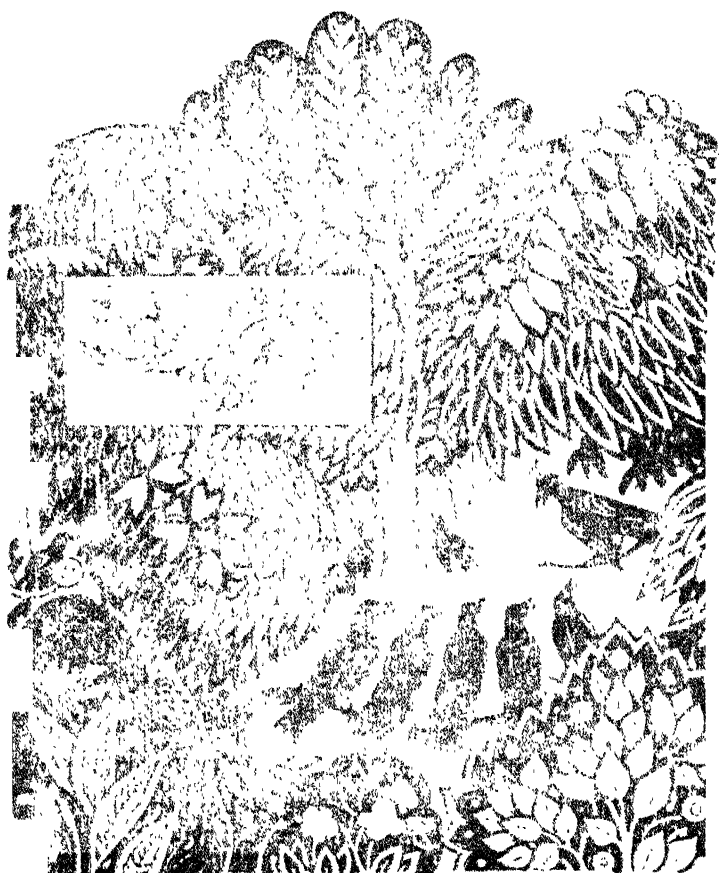
পঞ্চতন্ত্র ঃ তৃতীয় তন্ত্র ঃ কাকোলূকীয়

কাক আর পেঁচা স্বভাব-শত্রু। একে অপরকে দেখতে পারে না দুচোখে। দেখা হলেই বাধে ঝগড়া মারামারি। খুনোখুনিও যে না হয়, এমন নয়। নদীর এ-পারে ঝাঁকড়া গাছগুলোতে কাকেদের বাসা।

তারা সেখানে দুর্গ তৈরী করে বাস করে। তাদের রাজা মেঘবর্ণের আদেশে প্রহরীরা দুর্গের দরজা পাহারা দেয়।

ও-পারে পাহাড়ের গর্তে গর্তে অসংখ্য পেঁচা থাকে। দিনের বেলায় তারা চোখে দেখতে পায় না, তাই গর্ত থেকে বার হয় না। রাতে তারা দলবল নিয়ে বার হয়ে আসে। চারদিকে খাবার খুঁজে বেড়ায়, দলবল নিয়ে কাকেদের ছানা চুরি করে এনে খায়।

শত্রুতা করতে কাকেরাও কম যায় না। দিনের বেলায় তারা পাহাড়ে গিয়ে খুঁজে খুঁচিয়ে পেঁচার বাচ্চাদের ধরে খায়। কিন্তু এত করেও পেঁচাদের সঙ্গে পেরে ওঠে না। কেননা, পেচক-রাজা অরিমর্দের দুর্গ বড় কৌশলে তৈরী, কাকেরা তাতে ঢুকতে পারে না। কাকেরা এসে একদিন অভিযোগ করল, 'মহারাজ, পেঁচাদের হাত থেকে আমাদের বাঁচান। রোজ রাতে তারা আমাদের ছানা চুরি করে নিয়ে যায়!'

তা শুনে মেঘবর্ণ তার পাঁচজন মন্ত্রীকে নিয়ে গোপনে পরামর্শ-সভা ডাকল। সে বলল, 'মন্ত্রিগণ, আপনাদের পরামর্শমতই আমি চলি। এখন এই দুষ্ট পেঁচাদের হাত থেকে কেমন করে বাঁচা যায়, তারই পরামর্শ দিন।'

প্রথম মন্ত্রী বলল, 'মহারাজ, পেঁচারা আমাদের চেয়ে বলবান। অতএব ওদের সঙ্গে সন্ধি করে চলা উচিত।'

দ্বিতীয় মন্ত্রী বলল, 'মহারাজ, শত্রুকে বলবান মনে করা দুর্বলতার পরিচয়। আমরা যুদ্ধ করব পেঁচাদের সঙ্গে। কেননা, বীরেরাই পৃথিবীকে ভোগ করতে পারে।'

তৃতীয় মন্ত্রী বলল, 'মহারাজ, শত্রুরা প্রবল। চলুন, কিছুদিনের জন্য আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। পান্ডবদের মত শক্তিবৃদ্ধি করে এসে বাহুবলে পেঁচাদের হারিয়ে দিতে পারব।'

চতুর্থ মন্ত্রী বলল, 'মহারাজ, যুদ্ধ করবারও প্রয়োজন দেখি না, পালিয়ে যাওয়াও পছন্দ করি না। আমার মতে দুর্গটাকে সংস্কার করে মজবুত করা হোক, পাহারাদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হোক। তা হলে শত্রুর আর কোন ভয় থাকবে না।'

পঞ্চম মন্ত্রী বৃদ্ধ। সে বলল, 'মহারাজ, যুক্তিগুলো আমার মনে লাগছে না। আমার মতে শত্রুর শেষ করাই উচিত। যার সঙ্গে শক্তিতে পারব না, তাকে কৌশলে ধ্বংস করার নামই রাজনীতি। তা ছাড়া, ওদের সঙ্গে শত্রুতা তো আজকের নয়—বহুদিনের।'

তখন কাকেদের রাজা মেঘবর্ণ বলল, 'বৃদ্ধ মন্ত্রী, আপনি যদি কাক আর পেঁচার এই শত্রুতার কারণ জানেন, তবে বলুন, শুনতে বড় আগ্রহ হচ্ছে।'

তখন বৃদ্ধ মন্ত্রী বলতে লাগল, 'পেচক-রাজা'-র গল্প।
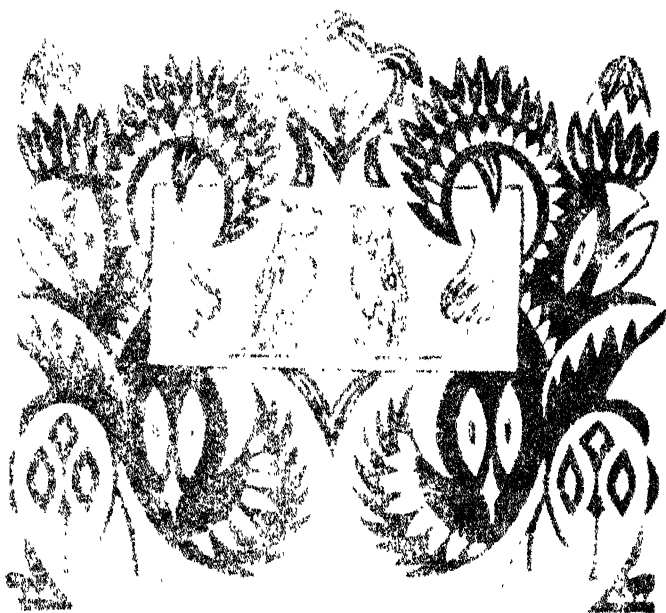
পেচক রাজা

সে অনেকদিন আগেকার কথা।

একবার সব পাখী মিলে বলল, 'দেখ আমাদের রাজা নেই। শুনতে পাই, গরুড় ছিলেন আমাদের রাজা। আমরা তো তাঁকে চোখেও দেখতে পাই না। তা ছাড়া, আমাদের প্রয়োজনের সময়ে তাঁর

সাহায্যও পাই না। অতএব, আমাদের মধ্য থেকে কাউকে রাজা করা হোক।'

কে রাজা হবে? কাকে রাজা করা যায়? কি কি গুণ থাকলে রাজা হওয়া যায়—এই-সব বিষয় নিয়ে বিস্তর যুক্তিতর্ক হল। অবশেষে ঠিক হল জ্ঞানী, গম্ভীর আর বুদ্ধিমান পেঁচাকেই রাজা করা হবে।

রাজা হওয়ার আনন্দে পেঁচা আর পেঁচী গিয়ে সিংহাসনে বসল। যত রাজ্যের পাখী মিলে হৈ-চৈ লাগিয়ে দিল। আজ তাদের নতুন রাজা-রানীকে অভিষেক করা হবে।

এমন সময় এক কাক এসে হাজির হল সেখানে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এত আনন্দের কি ব্যাপার হ'ল? হৈ-চৈ-ই বা কিসের জন্য?'

সারস বলল, 'জান না নাকি? আমরা আজ পেঁচাকে রাজা ও পেঁচীকে রানী করছি।'

কাক ব্যঙ্গ করে বলল, 'আহা হা! পেঁচার কী রাজপুত্তুরের মত চেহারা গো! কী তার মুখের ছিরি! দেখলেই হাসি পায়। যেমনি তার নাক, তেমনি তার চোখ। তা-ও যদি দিনের বেলায় দেখতে পেত! দিন-কানাকে রাজা করে কি হবে? অমন গরুড়ের মত রাজা থাকতে অন্য রাজার কী প্রয়োজন?'

পাখীরা বলল, 'তোমার গরুড়-রাজাকে তো আমরা দরকারের সময় পাই না, তাই অন্য রাজা ঠিক করেছি।'

কাক বলল, 'দেখ, রাজা করা চাই এমন লোককে, যার নাম শুনে শত্রুতেও ভয় পায়। তা ছাড়া, আমরা অমুক রাজার প্রজা বললে অনেক বিপদের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। একবার খরগোশেরা তো এই বলেই রক্ষা পেয়েছিল।'

পাখীরা বলল, 'কেমন করে বলুন।'

তখন কাক 'বোকা হাতী'-র গল্পটা বলল।

বোকা হাতী

চতুর্দন্ত নামে একটা সর্দারহাতী ছিল। অনেকগুলো হাতী ছিল তার অনুচর।

যে-বনে চতুর্দন্ত তার অনুচরদের নিয়ে থাকতো, একবার সেই

বনে দারুণ জলকষ্ট দেখা দিল। জলের কষ্টে হাতীরা ছটফট করতে লাগল।

তখন দলপতি তার অনুচরদের নিয়ে অন্য বনের দিকে চলে গেল। এখানে এক পাহাড়ের ধারে ছিল মস্ত একটা হ্রদ। তার জল ছিল কানায় কানায় ভর্তি। জল দেখতে পেয়ে হাতীর দল হ্রদে নেমে গেল। তারা প্রাণভরে হ্রদের মিষ্টি জল পান করল, জলে গা ডুবিয়ে স্নান করল, আর জল ছিটিয়ে নানারকম খেলা করতে লাগল। সকলে বলল, 'দলপতি, আমরা এখানেই থাকব। এখানে রয়েছে সুন্দর হ্রদ, আর এর আশেপাশে রয়েছে অসংখ্য গাছপালা। এমন জায়গা আর হয় না!'

সেই থেকে হাতীগুলো সেইখানেই রয়ে গেল।

এ-দিকে সেই হ্রদের তীরে তীরে গর্তের মধ্যে থাকত হাজার হাজার খরগোশ। চৌদ্দপুরুষ ধরে তারা সুখে বাস করছিল সেই হ্রদের তীরে। এখন, হাতীদের পায়ের চাপে তারা মারা পড়তে লাগল। খরগোশেরা চিন্তা করল, এভাবে চলতে থাকলে আমাদের একজনও আর বাঁচবে না!

একরাতে খরগোশদের এক জরুরী সভা বসল। কেমন করে হাতীর আক্রমণ থেকে বাঁচা যায় বা এ অবস্থায় কি করা উচিত, তা ঠিক করবার জন্যই এই সভার আয়োজন। এই সভায় তর্ক-বিতর্ক হল অনেক, কিন্তু কাজের কথা হল না কিছুই। অনেকে বলল, এদেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যাওয়া যাক। কিন্তু সকলে তা মানতে রাজী হল না।

কেউ বলল, 'কোন কৌশল করে হাতীদের তাড়ানো যায় না কি?'

সভাপতি বলল, 'তেমন সাহসী যদি কেউ থাকে, যে হাতীর কাছে দূত হয়ে যেতে রাজী আছে, তবে আমি একটা উপায় বলতে পারি।'

কিন্তু হাতীর কাছে যেতে কোন খরগোশেরই সাহসে কুলাল না।

অবশেষে ধবধবে ইয়া লম্বা সাদা কানওয়ালা লম্বকর্ণ নামে খরগোশ বলল, 'জাতির যাতে কোন উপকার হয়—সে যত ভয়ের কাজই হোক না কেন,—আমি তা করতে রাজী আছি। শাস্ত্রে আছে—কুলরক্ষার জন্য কুলের যে-কোন ব্যক্তিকে, গ্রামরক্ষার জন্য কুলকে, দেশ রক্ষার জন্য গ্রামকে এবং আত্মরক্ষাব জন্য প্রয়োজন হলে পৃথিবীকেও ত্যাগ করা উচিত।'

সভাপতির পরামর্শ অনুসারে লম্বকর্ণ গিয়ে হাতীদের দলপতিকে বলল, 'ওরে হাতীর সর্দার, আমি চন্দ্রের শশক, তোকে সাবধান করে দিতে এসেছি। আমার প্রভু চন্দ্রদেব তোদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন।'

দলপতি বলল, 'আমাদের অপরাধটা কি, বলুন!'

লম্বকর্ণ বলল, 'এ-অঞ্চলে চন্দ্রদেবের প্রজা খরগোশদের বাস। তোরা পায়ে পিষে তাদের মেরে ফেলেছিস। তাই প্রভু ক্রুদ্ধ হয়েছেন। বাঁচতে চাস তো এখনি পালা।'

দলপতি বলল, 'ওহে চন্দ্রদেবের দূত! বলতে পার, চন্দ্রদেব এখন কোথায় আছেন? আমি তাঁকে প্রণাম করতে চাই।'

লম্বকর্ণ বুদ্ধি করে বলল, 'তিনি এখন হ্রদের জলে এসে বসে রয়েছেন তোদের শাস্তি দেবার জন্যে। বিশ্বাস না হয়, নিজের চোখে দেখবি আয়।'

হ্রদের জলে চাঁদের যে ছায়া পড়েছিল, খরগোশ চতুর্দন্তকে তাই দেখাল। জলের ঢেউয়ে চাঁদের ছায়া কাঁপছিল, তাই দেখিয়ে খরগোশ বলল, 'দেখছ, প্রভু রাগে কাঁপছেন!'

হাতীর দলপতি প্রণাম করে বলল, 'চন্দ্রদেব, অপরাধ নেবেন না। পিপাসায় কাতর হয়ে এই হ্রদে এসেছিলাম। অন্যায় হয়ে গেছে। আজই আমরা চলে যাচ্ছি।'

হাতীরা চলে গেল। খরগোশেরা সুখে দিন কাটাতে লাগল।

গল্প শেষ করে কাক বলল, 'এইজন্যই বলছিলাম যে, গরুড়ের মত রাজা থাকতে আমি অন্য রাজা নির্বাচন করা পছন্দ করি না। পেঁচার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে রাজা করলে বিচারক বিড়ালের ছলনায় ভুলে চটকপাখী ও খরগোশের যে-দশা হয়েছিল, সেই দশাই হয়ে থাকে।'

পাখীরা বলল, 'আমরা অতশত না বুঝেই পেঁচাকে রাজা করতে চেয়েছি। 'বিচারক বিড়াল'-এর কি ঘটনা বলুন, শুনি।'

তখন কাক 'বিচারক বিড়াল'-এর কাহিনী বলতে লাগল।

বিচারক বিড়াল

কাক বলল, একবার আমি একটা গাছে বাসা বেঁধে থাকতাম। সেই গাছের গর্তে একটা চটকপাখী বাসা বেঁধেছিল। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বও হয়েছিল। একদিন চটকপাখী গিয়েছিল খাবারের খোঁজে। ফিরতে বিকেল হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে কখন খরগোশ এসে চটকপাখীর বাসাটা দখল করে বসল। সন্ধ্যাবেলা চটক এসে বলল, 'ভাই খরগোশ, তুমি ভুল করে আমার বাসায় ঢুকেছ। এ-কোটরে আমি থাকি।'

খরগোশ বলল, 'কোটরের গায়ে তো আর তোমার নাম লেখা নেই? অতএব এটা যে তোমার কোটর, তা আমি স্বীকার করি না। যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ এ-বাসা আমার।'

চটক বলল, 'আচ্ছা মুশকিলে পড়েছি! বাসার গায়ে আমার নাম লেখা নেই বটে, তবে এটা যে আমার বাসা, সে বিষয়ে অনেক সাক্ষী আছে। ঐ তো কাক রয়েছে, তাকেই জিজ্ঞাসা কর না।'

চটক আমায় দেখিয়ে দিল। আমি সত্য কথাই বললাম। আমি বললাম, 'আমি জানি, চটকপাখী এ-বাসায় অনেক দিন ধরে আছে।'

খরগোশ আমায় ঠাট্টা করে বলল, 'ধর্মপুত্র এসেছেন সাক্ষ্য দিতে! আমি ওর সাক্ষ্য মানি না। সকাল থেকে এ-বাসায় আমি আছি, এ-বাসা আমার।'

চটক বলল, 'কাকের সাক্ষ্য না মান, চল, কোন বিচারকের কাছে যাই।'

খরগোশ রাজী হয়ে বলল, 'বেশ, চল।'

চটক আর খরগোশ বিচারক খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল।

কিছুদূর যেতে না যেতেই তারা এক তপস্বীকে দেখতে পেল। এই তপস্বী আর কেউ নয়, স্বয়ং একটি বুড়ো বনবিড়াল! প্রাণিহত্যা ছেড়ে দিয়ে নাকি এখন জপতপ আর ধর্মকর্ম নিয়ে থাকে।

খরগোশ বলল, 'ঐ তো রয়েছেন একজন সদ্ব্যক্তি, নামাবলী গায়ে দিয়ে মালা জপ করছেন। ও'র উপরেই আমরা বিচারের ভার দেব।'

তারপর খরগোশ জোরে জোরে বলল, 'হে তপস্বী, আপনি বিচার করে বলুন, আমাদের মধ্যে কে বাসাটার অধিকারী।'

চটক বলল, 'আমার বাপ-ঠাকুরদার আমলের বাসাটা আজ কেমন করে খরগোশের হয়ে গেল, তা-ই বিচার করে বলুন।'

তপস্বী বনবিড়াল মালাজপ বন্ধ রেখে বলল, 'তোমরা কিছু বলছ মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার বয়স হয়েছে, তাই কানে কম শুনি। কাছে এসে বল, কি হয়েছে।'

বনবিড়াল যতই তপস্বী হোক, সে বনবিড়ালই। সে খরগোশ আর চটকপাখীর সাক্ষাৎ যম। তাই বনবিড়ালের আরও কাছে যাওয়া উচিত হবে কিনা, তা ভেবে তারা ইতস্ততঃ করতে লাগল।

খরগোশ আর চটককে ইতস্ততঃ করতে দেখে তপস্বী বনবিড়াল গম্ভীরস্বরে বলল, 'দেখ, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। বৃদ্ধ হলে ধর্মকর্মে মতি হয়। তা ছাড়া, আমি অহিংসাধর্মে দীক্ষা নিয়েছি। আমি বুঝতে পেরেছি যে, প্রাণিহত্যা মহাপাপ। যাঁরা ধর্মকর্মের জন্য অজ বা ছাগ বলি দেন, তাঁরা ভুল করেন। কারণ, অজ শব্দের মানে তাঁরা জানেন না। অজ শব্দের প্রকৃত অর্থ হল সাত বছরের পুরাতন ধান, ছাগ নয়। অধিকন্তু শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, বৃক্ষছেদন করে, পশু-হত্যা করে, রক্তের কর্দম করে যদি স্বর্গে যাওয়া যায়, তবে আর নরকে যাবে কে? যদি কিছু বলবার থাকে, কাছে এসে বল, আমার জপের বেলা বয়ে যায়।'

তপস্বীর কথা শুনে চটক আর খরগোশের মনে হল—ইনি যথার্থ তপস্বী বটেন! তাই বিশ্বাস করে দুজনেই নিজ নিজ অভিযোগ জানাবার জন্যে তপস্বীর একেবারে কাছে গেল। তপস্বী তাদের নাগালের মধ্যে আসতে দেখে একহাতে খরগোশকে এবং আর এক হাতে চটককে ধরে সুখে আহার করল।

কাক তার গল্প শেষ করে বলল, 'বুঝেছ, বুদ্ধিমানেরা যাকে তাকে রাজা করেন না। যাকে তাকে রাজা করলে আমাদেরও এমনি বিপদই হবে।'

কাকের কথা শুনে অন্যান্য পাখী বলল, 'দেখ, আমরা কী বোকার মত কাজ করতে যাচ্ছিলাম। ভাগ্যে কাক এসে গিয়েছিল! মানুষের মধ্যে যেমন নাপিত, পশুগণের মধ্যে যেমন শিয়াল, তেমনি পাখীদের মধ্যে কাকই চতুর। ওর কথামত কাজ করাই ভালো।'

এই বলে পাখীরা একে একে পালিয়ে গেল। শুধু বসে রইল পেঁচা-পেঁচী আর সেই কাকটি।

অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে পেঁচা ডেকে বলল, 'পেঁচী, পাখী-দের কোন আওয়াজ তো আর শুনতে পাচ্ছি না! ওরা গেল কোথায়? অভিষেক যে এখনও হয় নি!'

পেঁচী কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'হায় মহারাজ, দুষ্ট একটা কাকের পরামর্শে পাখীরা সব আমাদের ফেলে পালিয়ে গেছে। রাজারানী হওয়া আর আমাদের ভাগ্যে নেই!'

পেঁচীর কথা শুনে পেঁচা গিয়ে কাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাকও তাকে নাজেহাল করে পালিয়ে গেল। সেই থেকে কাক আর পেঁচার মধ্যে ঘোরতর শত্রুতা।

গল্প শেষ করে বৃদ্ধ মন্ত্রী বলল, 'আমি প্রস্তাব করি, শত্রুপক্ষের বল, দুর্বলতা ইত্যাদি জেনে তাকে নিপাত করা ভালো। তা ছাড়া, কৌশলে যেমন কাজ হয়, শক্তিতে তো তেমন হয় না। কৌশল করেই তিন ধূর্ত মিলে এক ব্রাহ্মণকে ঠকাতে পেরেছিল।'

মেঘবর্ণ জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন করে, বলুন।'

তখন বৃদ্ধ মন্ত্রী 'তিন ধূর্ত' গল্পটি বলল।

তিন ধূর্ত

সংসারে সাধুরাই সাধুদের বন্ধু হয়ে থাকেন, চোরের বন্ধু হয় চোর। একবার তিনটি ধূর্ত লোকের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। নানা অসদুপায়ে লোককে ঠকিয়ে তারা জীবনধারণ করত। লোককে ঠকাবার নিত্য নূতন ফন্দি আঁটত তারা।

শীতকালের এক বিকাল বেলা। তিন বন্ধু মাঠের মধ্য দিয়ে বড় রাস্তা ধরে চলছিল। এমন সময় তারা দেখতে পেল, এক ব্রাহ্মণ কাঁধে করে একটা ছাগ নিয়ে আসছেন। তাই দেখে একজন ধূর্ত বলল, 'দেখেছিস, বামুন পুজোর জন্যে শিষ্যের মাথায় হাত বুলিয়ে কেমন একটা পাঁঠা নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বামুনের বেশ বুদ্ধি, না?'

অন্য একজন বলল, 'বামুনের আবার বুদ্ধি কী রে? এরা কেবল অং রং বলে শাস্তর আওড়াতে পারে। ঘটে বুদ্ধি নেই এক ফোঁটাও।'

অপর ধূর্ত বলল, 'শীতটা বেশ পড়েছে। পাঁঠার মাংস খেলে শরীরটা বেশ গরম হত।'

দ্বিতীয় ধূর্ত আবার বলল, 'তবে আর বলছি কি, বোকা বামুনটা আমাদের সামনে দিয়ে পাঁঠা নিয়ে চলে যাবে! তাও কি হয়! গুরুর নাম করে চেষ্টা করে দেখি, বামুনটাকে ঠকান যায় কি না!'

তৃতীয় ধূর্ত বলল, 'তা নইলে আর আমরা ধূর্ত কিসের?'

প্রথম ধূর্ত বলল, 'আমারও আপত্তি নেই, কেননা, মাংস আমি বড্ড ভালবাসি।'

তারপর তারা নিজেদের মধ্যে কি সব ইঙ্গিত করে দূরে দূরে এক-একটা গাছের নীচে গিয়ে বসে রইল।

ব্রাহ্মণকে আসতে দেখে প্রথম ধূর্ত বলল, 'ঠাকুরমশাই, প্রণাম। কিন্তু এ কী! কুকুরটাকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?'

ব্রাহ্মণ॥ তোমার চোখ খারাপ হল নাকি হে! ছাগলটাকে কুকুর বলছ?

১ম ধূর্ত॥ আমার চোখ ঠিকই আছে। আপনার কী হল, কে জানে! আমি তো জন্মেও শুনি নি, একটা অপবিত্র কুকুরকে কেউ কাঁধে করে নিয়ে যায়।

ব্রাহ্মণ জোরে জোরে পা চালালেন। মনে মনে ভাবলেন, আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি। ছাগটাকে বলে কিনা কুকুর!

চলতে চলতে ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় ধূর্তের কাছে এলেন। দ্বিতীয় ধূর্ত বলল, 'ঠাকুরমশায়, এই মরা পশুটাকে কাঁধে নিয়ে চলেছেন কোথায়?'

ব্রাহ্মণ রেগে গিয়ে বললেন, 'চলেছি যমের বাড়ি। কোন্ আক্কেলে জ্যান্ত ছাগটাকে মরা বলছ, শুনি?'

দ্বিতীয় ধূর্ত নাছোড়বান্দা। সে হেসে বলল, 'মরা পশুটা কেমন করে জ্যান্ত হয়, তা আমি জানি না। বেশ, আপনি এটাকে কাঁধে করেই নিয়ে যান—লোকে দেখে হাসবে।'

ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবলেন, কী জানি! যজমান আমায় ঠকিয়ে দেয় নি তো! যাক, বাড়ি গিয়ে দেখি ব্যাপারটা কি।

ব্রাহ্মণ আর কিছুদূর যেতেই তৃতীয় ধূর্তের সঙ্গে দেখা হল। ব্রাহ্মণের দিকে চেয়ে সে হো হো করে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে সে বলল, 'ঠাকুর মশাই দেখছি একটা গাধার বাচ্চা কাঁধে করে নিয়ে চলেছেন! হো হো হো...'

তৃতীয় ধূর্তের কথা শুনে ব্রাহ্মণ ছাগটাকে তাড়াতাড়ি কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলেন। ভাবলেন, নিশ্চয়ই একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। নইলে সবাই একথা বলে কেন? পিছন দিকে না চেয়েই তিনি গ্রামের দিকে ছুটলেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, বাড়ি গিয়ে স্নান করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। একটা অপবিত্র পশুকে কাঁধে বহন করেছি! ছিঃ ছিঃ, এমন কাজ কেন করতে গেলাম? ভাগ্যি গাঁয়ের লোকে দেখে নি!

তার পর সেই তিন ধূর্ত পাঁঠার মাংস খেয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করল।

গল্প শেষ করে বৃদ্ধ মন্ত্রী বলল, 'মহারাজ, এখন আপনি বিচার করুন, কি করা উচিত।'

মেঘবর্ণ বলল, 'আপনাদের পরামর্শমতই চিরদিন চলে আসছি। এখন খুলে বলুন, কি করতে হবে।'

বৃদ্ধ মন্ত্রী বলল, 'আপনি দুর্গ ছেড়ে চলে যান। আমি এখানে আধ-মরার মত পড়ে থাকব। পরে পেঁচাদের বিশ্বাসভাজন হয়ে ওদের সর্বনাশ করব।'

সন্ধ্যা হতে না হতেই পেঁচারা খবর পেয়ে কাকেদের দুর্গ দখল করে বসল। পেঁচারা ভাবল যে, কাকগুলো তাদের ভয়ে দুর্গ ছেড়ে পালিয়েছে। তাই তারা খুব আমোদ-আহ্লাদ করতে লাগল।

এমন সময় পাহারাদারেরা একটা আধ-মরা কাককে বন্দী করে নিয়ে এল পেচক-মহারাজ অরিমর্দের কাছে। পাহারাদাররা বলল, 'মহারাজ, গাছের তলায় এ পড়ে ছিল, নিশ্চয় শত্রুর গুপ্তচর হবে।'

কাক জোড়হাতে বলল, 'মহারাজ অরিমর্দ, কাকেরা আজ আপনাদের আক্রমণ করতে চেয়েছিল। কেবল আমি বাধা দিয়েছি বলেই তারা তা পারে নি। আর দেখুন, আমি বাধা দিয়েছিলাম বলে আমার কী অবস্থা করে রেখে গেছে! এখন আমি আপনার শরণাগত। জ্ঞাতিরা আমায় আধ-মরা করে অপমান করে ফেলে রেখে গেছে—কোনদিন যদি পারি, এর শোধ নেব।'

পেচকরাজ অরিমর্দ গম্ভীর হয়ে বলল, 'এবিষয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছুই বলা যাবে না। ততক্ষণ এই কাককে বন্দী করে রাখো।'

পেচকরাজ মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন—কাকের সম্বন্ধে কী করা যায়।

প্রথম মন্ত্রী বলল, 'মহারাজ, এ শত্রু। শত্রুকে কোন রকমেই বিশ্বাস করতে নেই। অবিলম্বে একে বধ করে ফেলা হোক। জ্ঞাত-শত্রুর সঙ্গে এর চেয়ে ভালো ব্যবহার আর কী করা যেতে পারে?'

দ্বিতীয় মন্ত্রী বলল, 'মহারাজ, এ শরণাগত। একে বধ করা উচিত হবে না। আমি মনে করি, একে দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হোক। কেননা, একবার যার সঙ্গে শত্রুতা ছিল, এখন সন্ধি করে আর সে-প্রীতি ফিরে পাওয়া যাবে না। আমি একটি গল্প জানি, তাতে এক সাপ বলেছিল—হে ব্রাহ্মণ, প্রীতি একবার ভেঙে গেলে স্নেহ দ্বারা আর তা জুড়ে দেওয়া যায় না।'

মহারাজ অরিমর্দ জিজ্ঞাসা করল, 'গল্পটা বল, শুনে রাখা ভালো।'

তখন সেই মন্ত্রী বলতে লাগল, 'সাপের পুজো'-র কাহিনী।
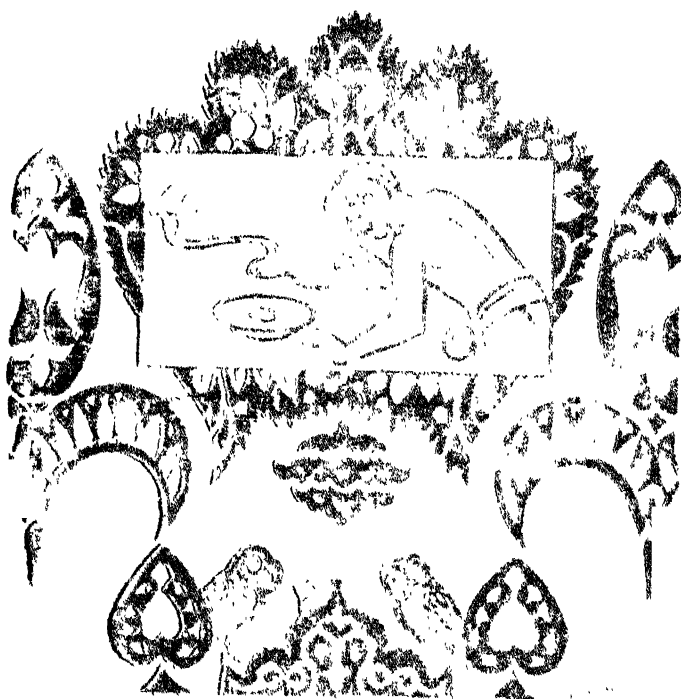
সাপের পুজো

ব্রাহ্মণের ছেলে হলে কি হবে, হরিদত্ত লেখাপড়া মোটেই করে নি। বাল্যে যে বিদ্যাশিক্ষা করে না, যৌবনে তার কষ্টের সীমা থাকে না।

হরিদত্তের কষ্টের সীমা ছিল না। চাষবাস করে সে জীবন কাটাত, বুড়ো মা-বাপকে খাওয়াত।

ভোর রাতে মই আর লাঙল কাঁধে নিয়ে তাকে মাঠে ছুটতে হত গ্রীষ্ম, বর্ষা আর শীতে। জলবৃষ্টিকাদায় তাকে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হত। তবু সে ভালো ফসল ফলাতে পারত না।

একদিন ভোরে হরিদত্ত যখন মাঠে এসে দাঁড়াল, তখন পূব-আকাশে সবে সূর্যদেব উঁকি দিয়েছেন। তাঁর সাতটি ঘোড়া সবে চলতে আরম্ভ করেছে।

হরিদত্ত মনে মনে সূর্যদেবকে প্রণাম করে কাজে লেগে গেল। কাজ করতে করতে হঠাৎ তার নজরে পড়ল, জমির একপাশে ঢিবির মত এক জায়গায় একটা বিষধর সাপ শুয়ে আছে।

হরিদত্ত প্রথমে ভয় পেয়ে গেল, পরে ভাবল, ইনি নিশ্চয় ক্ষেত্রের দেবতা। এঁকে সন্তুষ্ট করলে অনেক ফসল পাব।

হরিদত্ত বাড়ি গিয়ে একটা সরায় করে দুধ আর কলা এনে সেই সাপটাকে দিল। সাপ দুধকলা খেয়ে সরার মধ্যে একটা মোহর রেখে গর্তে ঢুকে পড়ল।

মোহর পেয়ে হরিদত্তের খুশি দেখে কে? সে রোজ সাপকে দুধ-কলা খাওয়ায় আর সাপ তাকে একটি করে মোহর দেয়।

কিছুদিন এইভাবে গেল। একদিন হরিদত্ত ভাবল, ঢিবির মধ্যে নিশ্চয় অনেক মোহর আছে, সাপটাকে মারতে পারলে মোহরগুলো সব একসঙ্গে পেয়ে যাবে।

শুভ কাজে বিলম্ব করতে নেই মনে করে হরিদত্ত সেইদিনই লাঠি দিয়ে সাপের মাথায় আঘাত করল। আচমকা আঘাত পেয়ে সাপটি রাগে জ্বলে উঠল। প্রকাণ্ড ফণা বিস্তার করে সে হরিদত্তকে কামড়ে দিল। হরিদত্ত মারা গেল।

খবর শুনে হরিদত্তের বাবা বড় শোক পেলেন। তবু তিনি কাঁদলেন না।

তিনি বললেন, 'শরণাগতকে রক্ষা করা উচিত ছিল। হরিদত্ত বিশ্বাসঘাতকতার ফল পেয়েছে। সাপকে তো আমি দোষ দিতে পারি না।'

হরিদত্তের বাবা এসে আবার সাপকে পুজো দিলেন। বললেন, 'হে ক্ষেত্রপাল সর্প, আপনি তুষ্ট হোন।'

সাপ বলল, 'মহাশয়, আপনাকে একটি মোহর দিচ্ছি, আপনি তা নিয়ে ফিরে যান, আর আসবেন না আমার কাছে। পুত্রশোক বড় শোক, আপনাকে আর বিশ্বাস করতে পারি না। ভয় হয়, কোনদিন আপনি হয়ত প্রতিহিংসা নিতে চাইবেন। তা ছাড়া, হে ব্রাহ্মণ, প্রীতি একবার ভেঙে গেলে স্নেহ বা ভালবাসা দিয়েও আর তা জোড়া দেওয়া যায় না।'

ব্রাহ্মণ তাঁর পুত্রের হঠকারিতার জন্য দুঃখ করে বললেন, 'আমার পুত্র শরণাগতের সঙ্গে হঠকারিতাপূর্ণ ব্যবহার করে নিজের সর্বনাশ করেছে। শরণাগতের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করতে নেই। শোনা যায়, একবার এক কপোত নিজের মাংস দিয়ে শরণাগত অতিথি ব্যাধের অর্চনা করেছিল।'

সাপ বলল, 'সে কি-রকম?'

তখন ব্রাহ্মণ বলতে লাগলেন 'অপূর্ব আতিথেয়তা'-র গল্প।
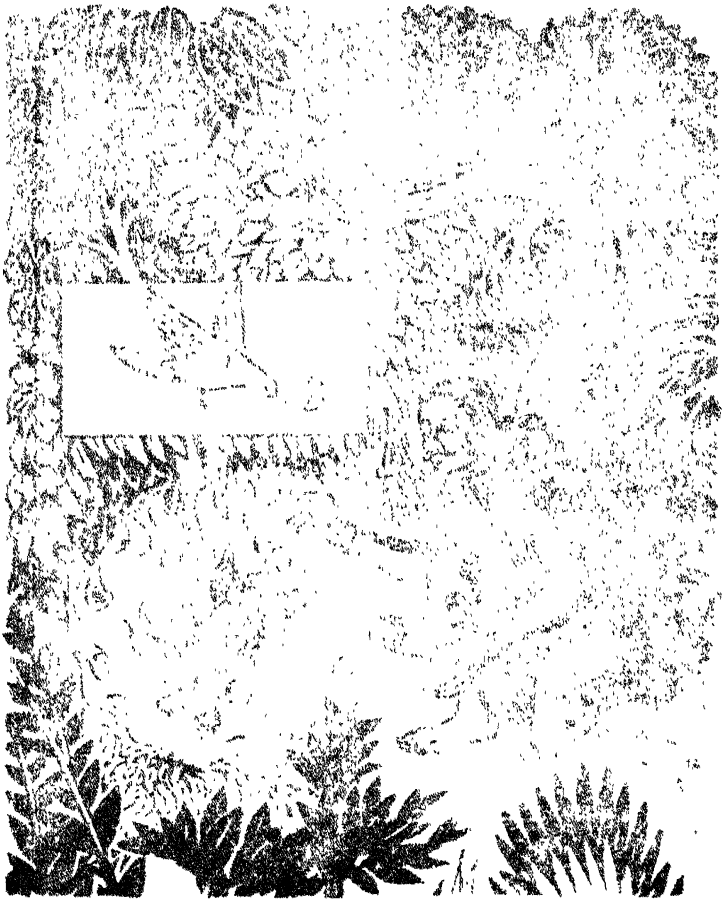
অপূর্ব আতিথেয়তা

কোন দেশে এক নিষ্ঠুর ব্যাধ ছিল। সে নানারকম নিষ্ঠুর উপায়ে পাখী ধরে জীবিকানির্বাহ করত। সেই ব্যাধ কেবল নিষ্ঠুরই ছিল না, স্বার্থপরও ছিল। সে নিজের স্ত্রী ছাড়া অপর কাউকেই বিশ্বাস

করত না। স্ত্রী ছাড়া অপর সকলের প্রতি সে কঠোর ব্যবহার করতে ছাড়ত না।

একদিন সেই ব্যাধ বনে পাখী ধরতে গেল। সারাদিন ঘুরে ঘুরে সে একটিমাত্র পায়রা ধরতে পারল। পৌষমাসের দিন। সূর্য অস্ত গেল সকাল সকাল। বনের মধ্যে হঠাৎ চারদিক অন্ধকার হয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল তীব্র শীত। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত আর শীতার্ত সেই ব্যাধ নিরুপায় হয়ে পায়রাটাকে নিয়ে একটা গাছে চড়ে বসল। উদ্দেশ্য রাতটা কাটিয়ে দেবে গাছে বসে।

সারাদিন না খেয়ে থাকায় ব্যাধের শরীর এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, বসে থাকা তার পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে উঠল। শীত ও ক্ষুধা তাকে একসঙ্গে আক্রমণ করে কাবু করে ফেলল। তার রক্ত জমে হিম হয়ে এল, হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেল। সে কাতর হয়ে বলল, 'হে বৃক্ষদেবতা, আমি ক্ষুধার্ত ও শীতার্ত। আমি তোমার শরণ নিচ্ছি। তুমি শরণাগতকে রক্ষা কর।'

অদৃষ্টের বিধানে সেই গাছেই ছিল এক কপোত-দম্পতি। আজ গাছে একলা বসে কপোতী কেবলই ভাবছিল, কপোত কোথায় গেল, কেন সে ফিরে এল না? তার কোন অমঙ্গল হয় নি তো!

কপোতী জানত না যে, কপোত বন্দী হয়ে ব্যাধের সঙ্গে এই গাছেই আশ্রয় নিয়েছে।

এ-দিকে কপোতীর দীর্ঘশ্বাস শুনে কপোত তাকে ডেকে বলল, 'কপোতী, তুমি আমার জন্য চিন্তা কোরো না! আজ তোমার ঘরে একজন অতিথি শীতে ও ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে। তুমি তার পরিচর্যা কর।'

কপোতী বলল, 'কপোত, তুমি এখানেই আছ জেনে আশ্বস্ত হলাম। আমি ব্যাধের কথাও শুনেছি। আমি গৃহস্থের ধর্ম পালন করব, শরণাগতকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব।'

এই বলে কপোতী খড়কুটো যোগাড় করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে বলল, 'হে অতিথি ব্যাধ, আপনি এই আগুনে হাত-পা গরম করে শীতকষ্ট দূর করুন।'

আগুনে সেঁকে ব্যাধ তার হাত-পা গরম করে নিল। অল্প সময়েই সে বেশ সুস্থ বোধ করল। তখন কপোতী বলল, 'হে ক্ষুধার্ত অতিথি, আমি সামান্য পাখী, আপনার সেবার জন্য কী বা দিতে পারি! আমার যা কিছু আছে, তা আমার এই ক্ষুদ্র দেহ—তাতেও হয়ত আপনার সম্পূর্ণ ক্ষুধানিবৃত্তি হবে না। আমার সে-অপরাধ ক্ষমা করবেন। আজ আমার দেহের সামান্য মাংস খেয়েই ক্ষুধা দূর করুন।'

এই বলে কপোতী আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সামান্য কপোতীর এই অপূর্ব আতিথেয়তা দেখে পাষাণহৃদয় ব্যাধের মনও মুগ্ধ হয়ে গেল। সে মনে মনে চিন্তা করল, আমি নির্দয় ব্যক্তি, নিজের ও স্ত্রীর সুখ ছাড়া অপরের সুখ বুঝি না! আজ এই কপোতী আমায় বড় শিক্ষা দিয়ে গেল। জীবনে যত পাপ করেছি, আজ তার প্রায়শ্চিত্ত হোক। জীবনে আর কুকাজ করব না। এই বলে সে ধৃত কপোতটাকে ছেড়ে দিল।

ছাড়া পেয়ে কপোত বলল, 'হে অতিথি, কপোতীর সামান্য দেহে আপনার ক্ষুধা দূর হবে না। অতএব, অতিথির সেবার জন্য আমার প্রাণও উৎসর্গ করছি।'

এই কথা বলতে বলতে কপোত ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুনে।

কিন্তু কী অপূর্ব ঘটনা! ব্যাধের চোখের সামনে কপোত আর কপোতী দিব্যদেহ ধারণ করে স্বর্গে চলে গেল।

গল্প শেষ করে পেচক-রাজ অরিমর্দের দ্বিতীয় মন্ত্রী বলল, 'মহারাজ, এইজন্যেই বলছি, শরণাগতকে রক্ষা করা উচিত।'

তৃতীয় মন্ত্রী বলল, 'মহারাজ, একে দূর করে দেওয়া উচিত হবে না। বরং পরস্পর বিবদমান শত্রুরা মিত্রের কাজই করে থাকে। এ-ক্ষেত্রে এই কাক আমাদের শত্রু আর তার জ্ঞাতি-কাকদের প্রতি বিরূপ। অতএব এর সাহায্যে আমরা শত্রু দমন করতে পারব। একবার এক ব্রাহ্মণ এইভাবেই রক্ষা পেয়েছিলেন।'

অরিমর্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন করে?'

তখন সেই মন্ত্রী 'চোর আর রাক্ষস'-এর গল্প বলতে লাগল।

চোর আর রাক্ষস
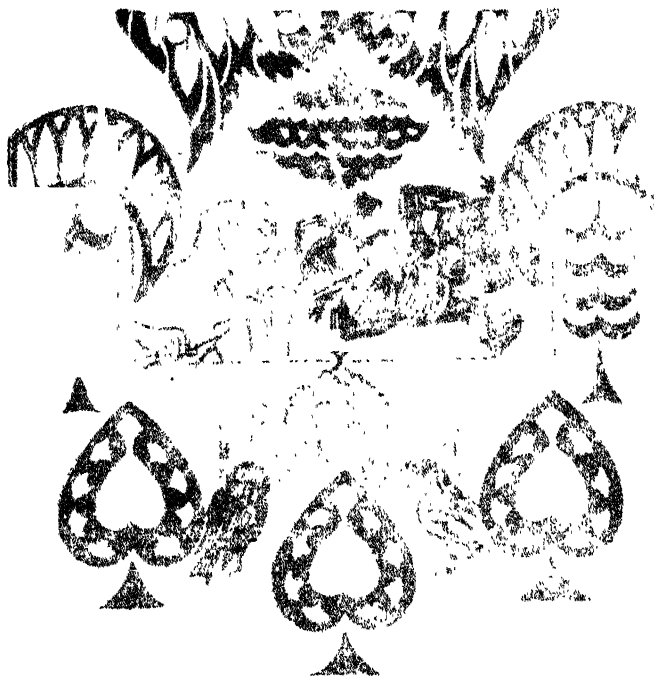
দ্রোণ নামে এক গরীব ব্রাহ্মণ ছিলেন।

দান ধ্যান, যজন-যাজন আর ব্রত-উপবাস করে সেই গরীব ব্রাহ্মণের দিন কাটত।

একবার তাঁর এক শিষ্য তাঁকে দুটি গরু দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ বহু-

যত্নে গরু দুটিকে পালন করতেন। যথাসময়ে গরু দুটির দুটি বাছুর হল। যত্নে পালিত গরু দুটি দুধ দিত প্রচুর।

এক গভীর রাত্রে এক চোর এল সেই ব্রাহ্মণের বাড়ির দিকে। তার উদ্দেশ্য গরু দুটি চুরি করা। চোর অতি সন্তর্পণে হেঁটে আসছিল।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল এক ভীষণ মূর্তি। মূর্তিটা আরও কাছে এলে চোর ভয়ে ভয়ে দেখল, সেই মূর্তিটা আর কেউ নয়, একটা বিরাট রাক্ষস। তার নাক উঁচু, চোখ দু'টি ভাঁটার মত জ্বলজ্বল করছে, লম্বা দাঁতগুলো বড় ধারালো, তার সারা গায়ের ও চুলের রঙ ঘোর পিঙ্গলবর্ণ। তার একমুখ গোঁফদাড়ি, দেহের শিরাগুলো যেন বেরিয়ে আসছে।

চোর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুমি? কি চাও?'

সেই রাক্ষস বলল, 'আমি রাক্ষস। আমার নাম সত্যবান। আজ আমি এই ব্রাহ্মণকে খেতে চলেছি। তুমি কে? তুমি কোথায় যাও?'

চোর বলল, 'আমি চোর। আমি এই ব্রাহ্মণের গরুদুটিকে চুরি করতে চলেছি।'

রাক্ষস বলল, 'তবে আর ভাবনা কি? আমরা দুই বন্ধু, কি বল? আমি ব্রাহ্মণকে খাব, আর তুমি গরু চুরি করবে।'

দু'জনে খুশী হয়ে হাঁটতে হাঁটতে ব্রাহ্মণের বাড়ি এসে ঢুকে পড়ল।

রাক্ষস বলল, 'দেখ ভাই চোর, আমি আগে ব্রাহ্মণকে খাব। কেননা, তুমি গরু চুরি করতে গেলে শব্দ হবে, ব্রাহ্মণ উঠে পড়বে, আমার আর তাকে খাওয়া হবে না।'

চোর বলল, 'কোনই শব্দ হবে না। বরং তুমি ব্রাহ্মণকে খেতে গেলেই ব্রাহ্মণের জেগে ওঠবার আশংকা আছে। কাজেই আমি চুরি করব আগে।'

তারপর সেই চোর আর রাক্ষস মিলে কে আগে তার কাজ সারবে, এই নিয়ে এমন ঝগড়া সুরু করল যে, তাতে ব্রাহ্মণ জেগে উঠে লাঠি নিয়ে তাদের তাড়া করলেন।

চোর আর রাক্ষস পালাল।

গল্প শেষ করে তৃতীয় মন্ত্রী বলল, 'মহারাজ, এইজন্যই বলছি, এই কাককে রেখে দিন, ভবিষ্যতে উপকার হবে।'

মন্ত্রীদের পরামর্শ শুনে পেচক অরিমর্দ কাককে ডেকে বলল, 'ওহে স্বজাতিপরিত্যক্ত কাক, আমি তোমায় অভয় দিলাম। তুমি আমার প্রজা হয়ে সুখে থাকবে। আর, যতদিন তোমার দেহ সুস্থ না হয়, ততদিন পেঁচারা তোমার জন্য খাদ্য যোগাবে।'

কাক বলল, 'মহারাজ অরিমর্দ, আজ আপাততঃ আমায় স্থান দিয়ে যে উপকার করলেন, তাতে ইচ্ছে হচ্ছে পেঁচা হয়ে জন্মে কাকদের উপযুক্ত সাজা দেই।'

পেচক-রাজের প্রথম মন্ত্রী কিন্তু কাককে আশ্রয় দেওয়া ভালো মনে করে নি। সে কাককে ঠাট্টা করে বলল, 'ওহে তোমার আর পেচক-জন্মে প্রয়োজন নেই, তোমার কাক-জন্মই প্রশংসার যোগ্য। তুমি যেমন করে শত্রুপক্ষের বিশ্বাসভাজন হলে, তাতে তোমার প্রশংসা না করে পারছি না। এরূপ শোনা যায় যে, ইঁদুরেরা সূর্য, মেঘ, বায়ু, পর্বত ও ভর্তাকে পরিত্যাগ করে স্বজাতি প্রাপ্ত হয়েছিল। কারণ, স্বজাতি পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার।'

অরিমর্দ বলল, 'ইঁদুরের ব্যাপারটা আমরা ঠিক জানি না। বল দেখি, কি ঘটনা হয়েছিল।'

তখন প্রথম মন্ত্রী 'স্বভাব না যায় মলে' এই উপদেশমূলক গল্পটি বলতে লাগল।
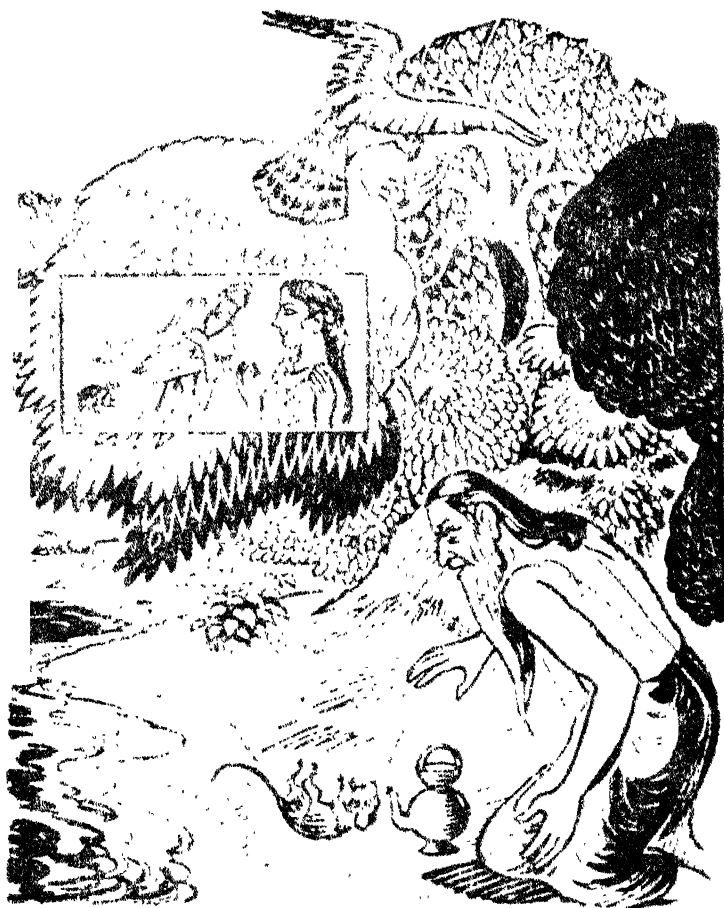
স্বভাব না যায় ম'লে

গঙ্গার তীরে এক মুনি আহ্নিকে বসেছিলেন। আহ্নিকের শেষে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করে যেমন তিনি উঠতে যাবেন, অমনি এক বাজপাখীর মুখ থেকে এতটুকু একটা ইঁদুরছানা কেমন করে যেন

পড়ে গেল তাঁর সামনে। মুনি ভাবলেন, ইষ্টদেবই ইঁদুরটাকে পাঠিয়েছেন। এটাকে আমি প্রতিপালন করব।

মন্ত্রের সাহায্যে মুনি ইঁদুরছানাটাকে একটা ছোট্ট মেয়েতে পরিণত করলেন। আশ্রমে এসে স্ত্রীকে বললেন, 'দেখ দেখ মুনি-পত্নী, সন্তান না থাকায় তোমার দুঃখ ছিল, এই মেয়েটিকে তুমি নাও।'

মুনিপত্নী সেই মেয়েটিকে গ্রহণ করলেন।

দেখতে দেখতে ষোলটা শীত-গ্রীষ্ম চলে গেল, মেয়ে বড় হয়ে উঠল। মুনিপত্নী বললেন, 'শুনছ, মেয়ের এবার বিয়ে দিতে হবে। এখন একটা সম্বন্ধ ঠিক কর।'

মুনি বললেন, 'তাই তো! বিয়ে দিতে হবে, সে খেয়াল তো করি নি! এখন পাত্র পাই কোথায়? পাত্র খুঁজে পাওয়া তো সহজ কথা নয়! শাস্ত্রে আছে—কুল, শীল, সহায়, বিদ্যা, বিত্ত, চেহারা ও বয়স দেখে পাত্র ঠিক করতে হয়। যাই হোক, একটা পাত্র ঠিক করতেই হবে।'

ভেবে ভেবে মুনি একটি পাত্র ঠিক করলেন, মেয়েকে কাছে ডেকে আদর করে বললেন, 'মা, যদি সূর্যের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিই, তোমার কোন আপত্তি আছে?'

মেয়ে॥ সূর্য বড় কড়া মেজাজের। তেজ কী রকম দেখুন না! ওকে বিয়ে করব না।

মুনি॥ তা হলে ত বড় মুশকিলের কথা! তবে মা, কাকে বিয়ে করবে?

মেয়ে॥ সূর্যের চেয়েও বড় কাউকে।

মুনি॥ সূর্যের চেয়ে বড় আবার কে? আচ্ছা সূর্যকেই জিজ্ঞেস করে দেখি।--সূর্যদেব, আপনার চেয়ে বড় কে?

সূর্য॥ আমার চেয়ে বড় হল মেঘ। মেঘ সময় সময় আমায় ঢেকে ফেলে।

সূর্যের কথা শুনে মেয়ে বলল, 'না, আমি মেঘকে বিয়ে করব না। ও বড্ড কালো। মেঘের চেয়েও বড় কাউকে বিয়ে করব।'

মুনি মেঘকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে মেঘ, বলে দাও তোমার চেয়ে বড় কে?'

মেঘ বলল, 'আমার চেয়ে বড় বায়ু। আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। খুশি-মত টুকরো টুকরো করে দেয়।'

মেয়ে শুনে বলল, 'ছি ছি, বায়ুকে কে বিয়ে করে? ও বড্ড চঞ্চল। ওর না বুদ্ধির, না মাথার ঠিক আছে! আরও বড় পাত্র চাই।'

মুনি বায়ুকে জিজ্ঞেস করলেন, তার চেয়ে বড় কে আছে। বায়ু বলল যে, তার চেয়ে বড় হল পর্বত। পর্বতে বায়ু বাধা পায়।

মেয়ে বলল, 'বুড়ো পর্বতকে আমি বিয়ে করব না। কিছুতেই না। ও তো নড়তেচড়তেও জানে না।'

মুনি বললেন, 'কী আশ্চর্য! পর্বতের চেয়েও বড় পাত্র চাই নাকি?'

মেয়ে॥ হ্যাঁ বাবা, পর্বতের চেয়েও বড় পাত্র চাই।

মুনি॥ ওহে আকাশস্পর্শী পর্বত, বলে দাও আমার মেয়ের জন্য তোমার চেয়েও বড় পাত্র কে আছে?

পর্বত॥ মুনিঠাকুর, আমার চেয়েও বড় হল ইঁদুর। ইঁদুর আমায় খুঁড়ে খুঁড়ে একাকার করে দেয়—আমায় এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়।

মুনি॥ ইঁদুরের সঙ্গে বিয়ে হলে আপত্তি করবে কি?

কন্যা হেসে বলল, 'না বাবা, ইঁদুরের সঙ্গেই আমার বিয়ে দিন। আমায় ইঁদুর করে দিন!'

মুনি কন্যাকে আবার ইঁদুর করে দিলেন। ইঁদুরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল।

গল্প শেষ করে প্রথম মন্ত্রী বলল, 'মহারাজ, আপনি, শত্রুর গুপ্তচর এই কাকের কথা বিশ্বাস করে নিজের এবং আমাদের বিপদ ডেকে আনছেন। অতএব, আমি আমার দলবল নিয়ে অন্য কোথাও যাচ্ছি।'

এই বলে সেই রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী অন্যত্র চলে গেল।

কাকটি কিন্তু রয়ে গেল সেই দুর্গে পেচকদের কাছে। মহারাজকে বলে সে দুর্গের দরজার কাছে একটি বাসা বাঁধল।

পেচকেরা সময়ে অসময়ে নানারকম খাদ্য সেই কাকটাকে এনে দিতে লাগল। কাক তাই খেয়ে সুখে বাড়তে লাগল। ক্রমে তার শরীরটা বেশ তাজা হয়ে উঠল। এখন থেকে সে নিজেই তার খাদ্য যোগাড় করে আর কাঠ-কুটো এনে বাসাটাকে বড় ও শক্ত করে তোলে। দেখতে দেখতে বাসাটা তার প্রকাণ্ড বড় হয়ে উঠল।

প্রথম প্রথম পেঁচারা সেই কাকটার উপর কড়ানজর রাখত। এখন বিশ্বাস করে নজর রাখে না।

সুযোগ বুঝে একদিন সেই বৃদ্ধ কাক লুকিয়ে গিয়ে মহারাজ মেঘবর্ণের সঙ্গে দেখা করে বলল, 'মহারাজ, সব ঠিক করে ফেলেছি। কাজ প্রায় শেষ, যেটুকু বাকী, তা আপনাদের করণীয়।'

মেঘবর্ণ বলল, 'কী করতে হবে বলুন।'

মন্ত্রী বলল, 'কাল দিনের বেলা, যখন পেঁচারা ভাল দেখতে পারবে না, তখন আপনারা গিয়ে একমুখো দুর্গের দরজায় আমি যে-বাসা বেঁধেছি, তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আসবেন। দেখবেন, একটি পেঁচাও জ্যান্ত থাকবে না।'

পরামর্শমত কাকেরা প্রত্যেকে এক-একটা জবলন্ত কাঠি মুখে করে নিয়ে দুর্গের মুখের সেই কাকের বাসাটায় ফেলতে লাগল। দেখতে দেখতে ভীষণ আগুন জবলে উঠল। দুর্গের মধ্যে ছিল হাজার হাজার পেঁচা। তাদের একজনও বেঁচে রইল না। শত্রুর ছলনায় ভুলে অরিমর্দ সবংশে পুড়ে মরল। মরবার সময় অরিমর্দ বলে গেল, 'মন্ত্রীরা যদি কুপরামর্শ দেয়, রাজা কী করতে পারে?'

ওদিকে রাজ্য ফিরে পেয়ে কাকেরা মহাখুশী হয়ে আনন্দ-উৎসব করতে লাগল। রাজা মেঘবর্ণ সেই বৃদ্ধ মন্ত্রীকে ডেকে বলল, 'আপনার জন্যই আমরা জয়ী হয়েছি। আপনার মত সৎপরামর্শদাতার জন্য গর্বিত। এখন দুএকটি তত্ত্বকথা বলুন।'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে বৃদ্ধ মন্ত্রী বলল, 'মহারাজ, আমার বলবার বেশি কিছু নেই। তবু দুএকটি উপদেশ আপনাকে দিচ্ছি, 'দেখুন, রাজ্য পেয়ে অনেকেই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে, তখন কুকাজ করতেও তাদের বাধে না। মনে রাখতে হবে, লক্ষ্মী বড় চঞ্চলা। তাঁকে চিরদিন রক্ষা করা কঠিন।

আরও এক কথা, লোভীর যশ, দুর্জনের মন্ত্রী, স্বার্থপর লোকের ধর্ম, বিলাসীর বিদ্যাবত্তা, কৃপণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং যে-রাজার মন্ত্রী অসাবধান বা অবিবেচক, তাঁর রাজ্য—সমস্তই নষ্ট হয়ে থাকে। পেঁচারা যদি তাদের বিজ্ঞ প্রথম মন্ত্রীর কথামত আমায় বধ করত বা তাড়িয়ে দিত, তবে উপযুক্ত কাজ করত। কিন্তু অরিমর্দের অন্য সব মন্ত্রী ছিল অবিবেচক। তাই তারা বিনষ্ট হল। 'আবার, আমি যে পেঁচাদের কাছে গিয়ে হীনতা স্বীকার করে রইলাম, তারও উদ্দেশ্য ছিল। এরূপ কথিত আছে যে, বুদ্ধিমান লোক দুঃসময়ে শত্রুকেও

কাঁধে বহন করে। যেমন একবার একটা সাপ ব্যাঙকেও বহন করেছিল।'

মেঘবর্ণ আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সাপ ব্যাঙকে বহন করেছিল!'

মন্ত্রী বলল, 'হাঁ মহারাজ, তবে শুনুন 'ছোট ছোট ব্যাঙ খাও', এই উপদেশপূর্ণ গল্পটা।'
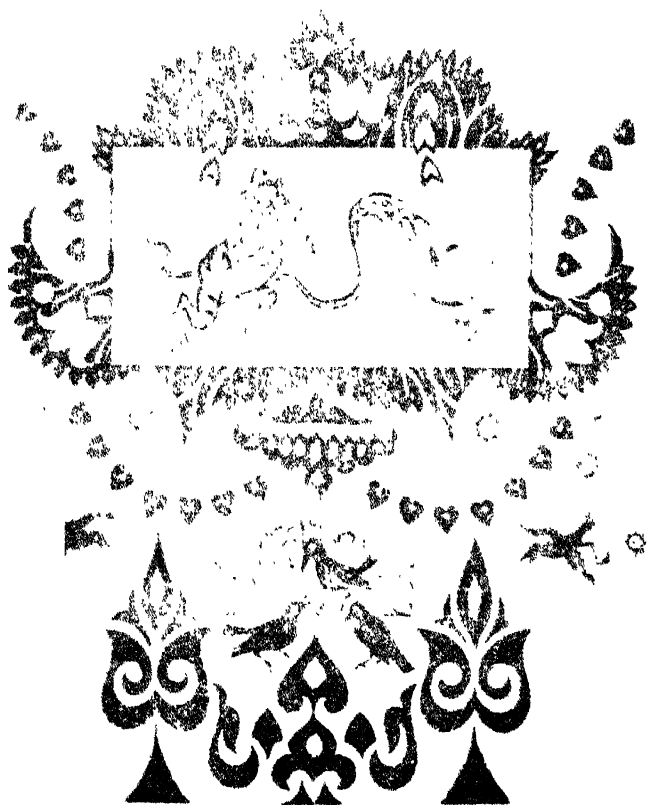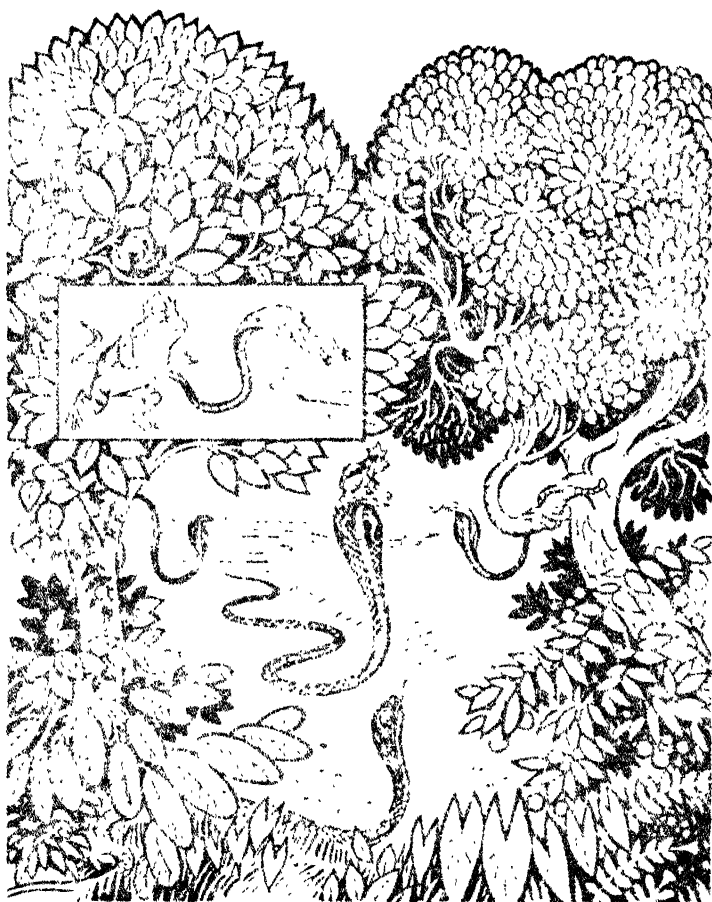
ছোট ছোট ব্যাঙ খাও

সাপের মত খল আর কে আছে? তার স্বভাব যেমন হিংস্র, তেমনি কুটিল। এই কুটিল স্বভাব সত্ত্বেও একবার এক সাপ ব্যাঙদের রাজার বিশ্বাসের পাত্র হয়েছিল। সেই বুড়ো সাপ আর তেমন

চলাফেরা করতে পারত না। তাই ছুটাছুটি করে ব্যাঙ ধরে খাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্যাঙদের রাজার সঙ্গে দেখা করে সে তাই কেঁদে বলল, 'ব্যাঙমহারাজ, জীবনে আমি যে কঠিন পাপ করেছি, আমায় তার প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন। নইলে আমার অনন্তকাল নরকভোগ হবে।'

সাপের মায়াকান্নায় ভুলে ব্যাঙরাজা বলল, 'তুমি যদিও আমাদের চিরকালের শত্রু, তবু তোমার বয়সের কথা চিন্তা করে আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। কী করতে পারি তোমার জন্য?'

সাপ বলল, 'হে দয়ার অবতার ব্যাঙমহারাজ, এক মুনি আমায় বলেছেন যে, আমি যদি বাকী জীবন ধরে ব্যাঙমহারাজকে নিয়ে থাকি, তবেই আমার প্রায়শ্চিত্ত করা হবে। সারাজীবন যত ব্যাঙকে হত্যা করেছি, এই শাস্তি গ্রহণ করলে আমি তার পাপ থেকে মুক্ত হব। আমার মাথায় চড়ে আমার জীবন ধন্য করুন।'

তখন সেই পরদুঃখকাতর ব্যাঙরাজা সাপের মাথায় চড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সাপের মত শত্রুর মাথায় চড়া কম গৌরবের কথা নয়!

এদিকে সাপ ব্যাঙকে মাথায় নিয়ে ঘুরছে দেখে অন্য সাপেরা বলল, 'ওহে কুলাঙ্গার, ব্যাঙ আমাদের ভক্ষ্য, তুই তাকে মাথায় নিয়ে আমাদের বংশের মুখে কালি দিলি!'

তখন প্রত্যুত্তরে বলল সেই ব্যাঙমাথায় সাপটি, 'ভাই সব, কার্য-সিদ্ধির জন্য অনেক অপমানকর কাজও করতে হয়। তাতে লজ্জা কিসের?'

সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সেই সাপ ব্যাঙরাজাকে মাথায় নিয়ে ঘুরত। তারপর যখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তখন সে বলত, 'মহারাজ ব্যাঙ, ক্ষুধায় বড় কাতর হয়ে পড়েছি। আর তো চলতে পারছি না!'

ব্যাঙরাজা বলত, 'বটেই তো! সারাদিন ঘুরে বেড়ালে কার না খিদে পায়! তুমি এক কাজ কর বাপু—ছোট ছোট কয়েকটা ব্যাঙ ধরে খাও।'

এইভাবে দিন চলে। ক্রমে সেই ব্যাঙরাজার প্রজা বলতে আর একটি ব্যাঙও রইল না। অবশেষে একদিন ব্যাঙরাজাকে দিয়েই সেই দুষ্ট সাপ জলযোগ করল।

গল্প শেষ হতে মহারাজ মেঘবর্ণ বলল, 'মন্ত্রিবর, আপনার কৌশলেই শত্রুগণ নিহত হয়েছে। আজ আমি নিষ্কণ্টক। শাস্ত্রে আছে—জ্ঞানী লোক ঋণের শেষ, আগুনের শেষ, শত্রুর শেষ আর রোগের শেষ রাখেন না। আপনি সত্যই জ্ঞানী।'

মন্ত্রী বলল, 'মহারাজ, মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য করেছি মাত্র, তার বেশি কিছু করি নি। তারপর যে-কথা বলছিলাম, মহারাজ, আমি রাজা, এই বলে গর্ব করতে নেই। কেননা, কাল সকলকেই বিনাশ করে। নইলে সেই ইন্দ্রসুহৃৎ রাজা দশরথ আজ কোথায়? সাগরতীর-বন্ধনকারী মহারাজ সগরই বা কোথায় গেলেন? সূর্যের পুত্র মনু-ই বা কোথায়? মহারাজ, এসব কথা একটু চিন্তা করবেন, মান্ধাতা কোথায় গেলেন? যিনি দেবতাদের উপর আধিপত্য করে-ছিলেন, সেই রাজা নহুষই বা আজ কোথায়? কাল সকলকে সৃষ্টি করে, আবার কালই সকলকে হরণ করে।'

মেঘবর্ণ বলল, 'নীতিশাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রী, আপনার কথা শুনে মনে শান্তিলাভ করলাম।'

এর পর আরম্ভ হল চতুর্থ তন্ত্রের 'লব্ধ-প্রণাশ'-পর্যায়ের গল্প।

॥ তৃতীয় তন্ত্র সমাপ্ত ॥

পঞ্চতন্ত্রঃ চতুর্থ তন্ত্রঃ লব্ধ-প্রণাশ

যমুনার তীরে কত কালের প্রকাণ্ড একটা জামগাছ ছিল। সেই জামগাছে সারা বছর ধরে জাম ফলত। তার ফলগুলো ছিল যেমন বড়, তেমনি মিষ্টি, যেন অমৃত।

এই জামগাছে থাকত এক বানর। সারা বছর ধরে জাম খেয়ে সে বেঁচে থাকত। তিনকুলে তার কেউ ছিল না. থাকবার মধ্যে ছিল এক বন্ধু কুমীর। দুই বন্ধুতে বড় ভাব! কুমীর রোজ আসত জামগাছের গোড়ায়, ডাঙায় উঠে রোদ পোহাত আর বানর-বন্ধুর সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় কাটাত। সন্ধ্যে হলে কুমীর তার ঘরে চলে যেত। যাবার সময় বানর বলত, 'বন্ধু, এই জামগুলো নিয়ে যাও, তোমার বৌকে দিও।'

কুমীরের বৌ ছিল বড় লোভী! সে একদিন কুমীরকে বলল, 'দেখ, যদি কথা রাখ, তবে মনের একটা ইচ্ছা তোমায় বলি!'

কুমীর বলল, 'গিন্নী, কবে তোমার কথা রাখি নি যে, আজ এমন করে বলছ? তুমি যা বলবে, আমি তাতেই রাজী।'

কুমীর-বৌ বলল, 'আমার মনে হয়, দিনরাত জাম খেয়ে খেয়ে তোমার বানর-বন্ধুর হৃৎপিণ্ডটা অমৃতের মত রসাল ও স্বাদু হয়েছে। আমি ওর হৃৎপিণ্ডটা খেতে চাই। তুমি তাকে নিয়ে এস।'

কুমীর বলল, 'একী কথা গিন্নী! বানর যে আমার পরম বন্ধু, আমি তার কোন অনিষ্ট করতে পারব না।'

বৌ বলল, 'বানরকে না নিয়ে এলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব!'

কুমীর আর কি করে! বৌকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বলল, 'তোমাকে আর মাথা খুঁড়ে মরতে হবে না; দেখি কি করতে পারি।'

অন্যসব দিনের মতই কুমীর গেল বানরের কাছে। অন্যদিনের মতই সে তার সঙ্গে গল্পগুজব আরম্ভ করল। তার পর সুযোগ বুঝে এক সময় বলল, 'বন্ধু বানর, আজ তোমায় একটা কথা রাখতে হবে! তোমার সঙ্গে অনেক দিনের বন্ধুত্ব। বল, আমার কথা রাখবে?'

বানর বলল, 'যদি অসম্ভব না হয়, আমি নিশ্চয় তোমার কথা রাখব।'

কুমীর বলল, ‘আমাদের এতদিনের বন্ধুত্ব, অথচ বল দেখি কখনও আমার বাড়ি গেছ কি? আমি তো রোজ আসি তোমার বাড়ি। আজ তোমার বৌদি আমায় ঠাট্টা করে বলল, কেমন তোমাদের বন্ধুত্ব! একদিনও বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলে না! আজ নিশ্চয়ই নিয়ে আসবে। আমি পিঠে-পায়েস তৈরী করে রাখব। কাজেই বন্ধু, তোমায় আজ যেতেই হবে।’

বানর বলল, ‘বৌদিকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলো যে, আমি তার নিমন্ত্রণ পেয়ে বড় খুশী হয়েছি। কিন্তু তিনি থাকেন মাঝ-নদীতে চরের মধ্যে। সেখানে আমি কেমন করে যাব? তিনি বোধ হয় জানেন না যে, বানর সাঁতার জানে না।’

কুমীর বলল, ‘আমি তোমায় পিঠে করে নিয়ে যাব! আজ সে তোমার জন্য পিঠে তৈরী করে বসে থাকবে, তোমায় না নিয়ে গেলে হয়ত কেঁদেই ভাসাবে।’

কুমীরের কথা বিশ্বাস করে বানর তার পিঠে চড়ে রওনা হল। বানরকে পিঠে নিয়ে কুমীর চলতে লাগল সাঁতার কেটে কত ঢেউয়ের উপর দিয়ে, কত জলের পাক এড়িয়ে। বানর কিন্তু কুমীরের পিঠে বসে ইষ্টনাম জপতে লাগল, তার বড় ভয় হচ্ছিল। কুমীরকে ডেকে বলল, ‘বন্ধু, আমার বড় ভয় হচ্ছে ঢেউগুলো দেখে, খুব সাবধানে যেও। আমি কিন্তু মোটেই সাঁতার জানি না।’

কুমীর মুখে বলল, ‘ভয় কি বন্ধু! এই তো আমরা প্রায় এসে গেছি।’

কিন্তু মনে মনে কুমীর ভাবল, আসল কথাটা এবার বলি বানরটাকে, আর তো সে পালাতে পারবে না। দেখি ও কি বলে। এই ভেবে সে বলল, ‘বন্ধু বানর, কেন তোমায় নিয়ে যাচ্ছি, জান?’

অজানা আশঙ্কায় বানরের বুক কেঁপে উঠল। তবু সে বলল,

'জানি বৈ কি! তোমার বৌ নিমন্ত্রণ করেছে, তাই আমায় তোমার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ।'

কুমীর বলল, 'পোড়া কপাল! যদি জানতে কেন নিয়ে যাচ্ছি, তা হলে কি কখনও আসতে আমার সঙ্গে? বন্ধু, তোমার বৌদির ইচ্ছে হয়েছে তোমার হৃৎপিণ্ডটা খেতে। তাই মিথ্যে কথা বলে তোমায় নিয়ে এলাম। এখন ইষ্টনাম জপ কর।'

বানরের মাথাটা ঘুরে গেল কুমীরের কথা শুনে। তার বুকের স্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে গেল। তবু বিপদে সাহস হারাল না সে। সে বলল, 'ছি ছি বন্ধু! কথাটা আমায় আগে বল নি কেন? নাঃ, বৌদিকে দেখছি হতাশ হতে হবে! হৃৎপিণ্ডটা যে জামগাছে রেখে এসেছি!'

কুমীরের বুদ্ধিটা একটু মোটা। সে বলল, 'তা হলে উপায়? গিন্নী যে রাগ করবে!'

বানর তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বলল, 'উপায় আর কি? অন্যদিন নিয়ে আসব। আজ আর তো ফিরে যাওয়া যায় না, বৌদি যে বসে রয়েছেন!'

কুমীর বলল, 'তা হয় না। চল, এখুনি গিয়ে তোমার হৃৎপিণ্ডটা নিয়ে আসি। আমি আরও জোরে সাঁতার কেটে যাব আসব।'

কুমীর ফিরে চলল জামগাছের দিকে, বানরের হৃৎপিণ্ডটা নিয়ে আসতে। বানর সর্বক্ষণ দুর্গানাম জপ করতে লাগল। খুব শীঘ্রই কুমীর ফিরে এল জামগাছটার তলায়। মাটির নাগাল পেয়ে বানরের মনে হল, সে যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছে! এক লাফে সে গিয়ে উঠে পড়ল জামগাছে। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে বসে অদৃষ্টের কথা ভাবতে লাগল।

কুমীর ডেকে বলল, 'ওকী বন্ধু! দেরী কোরো না। বৌ যে বসে রয়েছে তোমার জন্য!

বানর বলল, 'ওরে মূর্খ কুমীর, হৃৎপিণ্ড প্রাণীর একটাই থাকে,

আর তাকে গাছে ঝুলিয়ে রেখে যাওয়া যায় না। তোর বোকামির জন্যই প্রাণটা ফিরে পেলাম।'

কুমীর মনে মনে চিন্তা করল, তাই তো! বড্ড বোকামি হয়ে গেছে। যাক, দেখি ভুল শোধরানো যায় কিনা। বানরকে সে ডেকে বলল, 'বন্ধু এতক্ষণ তোমায় পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। নইলে আমি কি আর জানি না যে, প্রাণীর একটাই হৃৎপিণ্ড থাকে, আর কেউ তা গাছে ফেলে আসতে পারে না? ঠাট্টা না বুঝে তুমি বড্ড ভয় পেয়ে গেছ! এস, এস, ওদিকে গিন্নী যে বসে রয়েছে!'

বানর বলল, 'বটে? নেড়া আর বেলতলায় যাবে না। গঙ্গাদত্ত কি আর কখনও ডোবায় ফিরে গিয়েছিল?'

কুমীর বলল, 'গঙ্গাদত্ত কে? সে আবার কি করেছিল?'

তখন বানর বলতে লাগল 'নির্বুদ্ধিতার পরিণাম'-এর গল্পটি।

নির্বুদ্ধিতার পরিণাম

জ্ঞাতিদের সঙ্গে গঙ্গাদত্ত নামে এক ব্যাঙের ঝগড়া চলছিল অনেক দিন থেকে। অবশেষে জ্ঞাতিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গঙ্গাদত্ত তার দলবল নিয়ে ডোবাটা ছেড়ে চলে গেল। যাবার সময়

সে বলে গেল, 'যেন তেন প্রকারেণ তোদের শেষ করে, তবে ফিরব এই ডোবায়। নইলে আমার নাম গঙ্গাদত্তই নয়।'

ডোবা থেকে বেরিয়ে এসে সে উপায় চিন্তা করতে লাগল। এমন সময় সে দূরে একটা সাপকে দেখতে পেল। সাপ দেখে তার মগজে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে সেই সাপকে ডেকে বলল, 'ওহে বন্ধু, কোথায় চলেছ?'

সাপ তাকে প্রথম চিনতে পারে নি। কাছে এগিয়ে এসে দেখল একটি ব্যাঙ তাকে বন্ধু বলে সম্বোধন করছে।

সাপ বলল, 'ওহে ব্যাঙ, তুমি আমায় বন্ধু বলে ডাকছ বটে, কিন্তু আমি তো তোমায় চিনি না! কেমন করে তোমায় বন্ধু বলে ভাবি? স্বয়ং বৃহস্পতি বলে গেছেন, যার কুল, স্বভাব আর বাসস্থান অজ্ঞাত, তার সঙ্গে ভুলেও বন্ধুত্ব করবে না।'

গঙ্গাদত্ত কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'বৃহস্পতি নমস্য। কিন্তু আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থী বন্ধু, তোমায় সাহায্য করতেই হবে।'

সাপ বলল, 'কিরকম সাহায্য শুনি।'

গঙ্গাদত্ত বলল, 'দেখ বন্ধু, জ্ঞাতিরা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি প্রতিহিংসা নিতে চাই।'

একটু থেমে সে আবার বলল, 'তোমায় খুব ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে, আমি যদি তোমার খাবার ব্যবস্থা করে দিই?'

সাপ বলল, 'বুঝতে পেরেছি তোমার মতলবখানা। তোমার জ্ঞাতিদের খেয়ে সাবাড় করে দিতে হবে—এই তো? মন্দ কি! আমার আপত্তির কোন কারণ নেই। চল কোথায় নিয়ে যাবে।'

কুলাঙ্গার গঙ্গাদত্ত সেই সাপকে ডোবাটা দেখিয়ে দিল। সাপ মনের আনন্দে গঙ্গাদত্তের জ্ঞাতিদের ধরে ধরে খেতে লাগল। অল্প-দিনের মধ্যেই তারা শেষ হয়ে গেল।

খুশী হয়ে গঙ্গাদত্ত বলল, 'ভাই সাপ, তোমার কাজ শেষ হয়ে গেল, এবার তুমি যেতে পার।'

সাপ বলল, 'এ কি বন্ধুর মত কথা হল? তুমিই তো আমায় এখানে এনেছিলে। তোমার জন্যই তোমার জ্ঞাতিদের সাবাড় করলাম। এখন খাবার যুগিয়ে আমার উপকার কর। রোজ অন্ততঃ একটা করে ব্যাঙ আমার চাই-ই চাই।'

নিরুপায় হয়ে গঙ্গাদত্ত ভাবল, খাল কেটে ঘরে কুমীর আনলাম! সে যে এখন আমায় খেতে চাইবে! যা হোক, পণ্ডিতেরা বলে গেছেন, অনেকের স্বার্থের জন্য প্রয়োজন হলে একজনকে ত্যাগ করবে। অতএব সে সাপকে বলল, 'তুমি আমার দলের ব্যাঙদের ভেতর থেকে এক-একজনকে খেয়ো।'

সাপ বলল, 'উত্তম প্রস্তাব, একেই তো বলে বন্ধুত্ব।'

তার পর অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেই উদরসর্বস্ব সাপ গঙ্গাদত্তের ছেলেমেয়েদের অবধি খেয়ে ফেলল। বাকী রইল একা গঙ্গাদত্ত। বেগতিক দেখে সে সাপকে বলল, 'বন্ধু, তোমার খাদ্য তো ফুরিয়ে গেল। আমি অন্য কোনও ডোবায় তোমার খাবার খুঁজে আসি।'

এই বলে গঙ্গাদত্ত প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। কারণ, ক্ষুধার্ত সাপে কী না করতে পারে?

একদিন অন্য একটা ব্যাঙকে ডেকে সেই সাপ বলল, 'ওহে তোমাদের গঙ্গাদত্তকে দেখতে পেলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।'

তারপর সেই ব্যাঙ গিয়ে গঙ্গাদত্তকে বলল, 'তোমার বন্ধু সাপ তোমায় খুঁজছে, একবার যাও তার কাছে!'

গঙ্গাদত্ত নাকে খৎ দিয়ে বলল, 'না দাদা, গঙ্গাদত্ত আর ওমুখো হচ্ছে না।'

গঙ্গাদত্তের গল্প শেষ করে বানর বলল, 'বুঝেছ বুদ্ধিমান কুমীর, তোমার বাসায় আমি আর যাচ্ছি না। আমি লম্বকর্ণের মত বোকা নই।'

কুমীর বলল, 'লম্বকর্ণ আবার কে?'

তখন বানর বলতে লাগল 'গাধার বিয়ে'-র গল্প।

গাধার বিয়ে
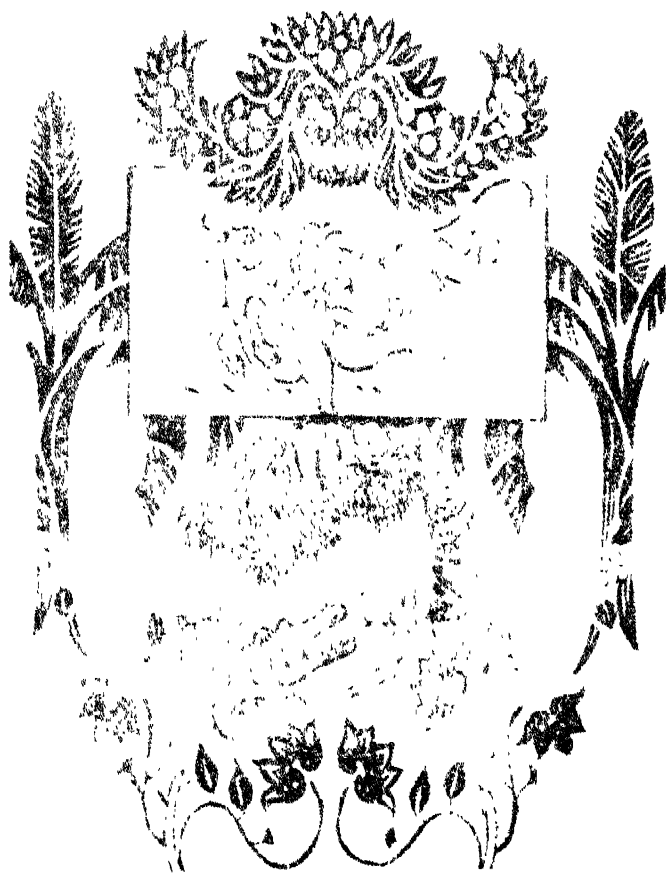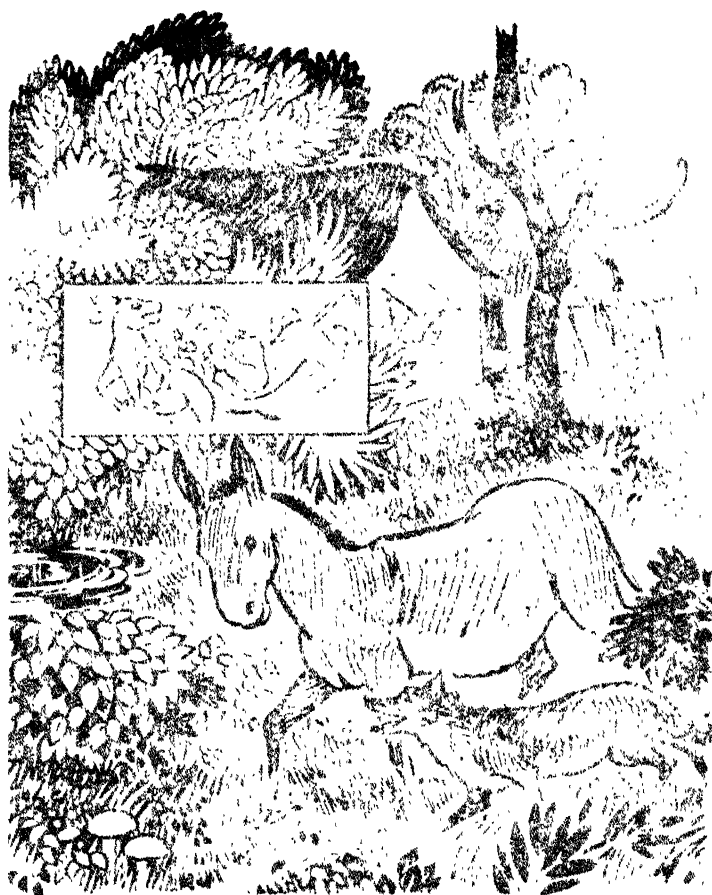
সিংহ মামা, আর শিয়াল ভাগ্নে। মামার উপযুক্ত ভাগ্নেই বটে! সিংহ শিকার করে, শিয়াল পথ দেখায় আর প্রসাদ পায়। এই করেই মামা-ভাগ্নের দিন কাটে।

একদিন মামা-ভাগ্নে শিকার করতে গিয়ে একটা হাতীর দেখা

পেল। সিংহ ভাবল, হাতীটাকে মারতে পারলে বর্ষাকালটা ঘরে বসে খাওয়া যায়। ভাগ্নের সাহস ছিল, মামা তাই এগিয়ে গিয়ে হাতীকে আক্রমণ করল। মামার সেদিন নেহাত কপাল ছিল মন্দ, তাই হাতীর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে কোমরটা গেল মচ্‌কে। সসম্মানে পালিয়ে সে বাঁচল।

কোমরের ব্যথায় সিংহ নড়তে-চড়তে পারে না। তাই আর তার শিকার করা হয় না। মামা-ভাগ্নে তাই উপোস করে থাকে। এইভাবে গেল কদিন।

শেষে একদিন খিদের জ্বালায় কাতর হয়ে সিংহ বলল, 'ভাগ্নে, তুমি নিরীহগোছের একটি জন্তু তাড়িয়ে নিয়ে এস আমার গুহার কাছে, আমি কোনরকমে তাকে বধ করব।'

শিয়াল বলল, 'তাই হোক মামা। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি অবধি হজম হয়ে গেল! আর দুএকদিন এভাবে চললে আমি সুদ্ধ হজম হয়ে যাব। আমি চললাম। দেখি কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

ঘুরতে ঘুরতে শিয়াল গিয়ে এক ধোপার বাড়ির পিছনে হাজির হল। সে দেখল, বেশ সুন্দর নাদুসনুদুস একটি গাধা চরে বেড়াচ্ছে! শিয়াল ভাবল, এর চেয়ে নিরীহ আর বোকা জন্তু কোথায় পাব? একেই নিয়ে যাব মামার কাছে!

একপা দুপা করে শিয়াল এগিয়ে গেল গাধাটার কাছে। গিয়ে বলল, 'নমস্কার দাদা লম্বকর্ণ, ভালো আছ তো? অনেক দিন পর দেখা হল। সব কুশল তো? ছেলেমেয়েরা সব ভালো আছে তো?'

'দাদা' বলে সম্বোধন করায় লম্বকর্ণের বেশ একটু গর্ব হল। সে বলল, 'তা ভাই, আছি কোনরকম। তোমার সব কুশল তো? ছেলে-মেয়ের কথা কি বলছ হে! তুমি কি জান না যে, আমি বিয়েই করি নি?'

শিয়াল বলল, 'সে কি কথা, দাদা! আমি দুনিয়াসুদ্ধ ঘটকালি করে বেড়াই, আর তোমার পাত্রী জোটে না! আজকেই তোমার বিয়ে দেব। চল আমার সঙ্গে, পাহাড়ের ধারে জঙ্গলের ভিতর অনেকগুলো মেয়েগাধা রয়েছে, তারা এক-একটি অপরূপ সুন্দরী। তারা বলেছে যে, তারা স্বয়ংবরা হবে। আমি তাই পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি। দাদার কথাটা মনেই ছিল না। চল চল, আর দেরি নয়।'

বিয়েপাগল লম্বকর্ণ শিয়ালের কথায় সহজেই রাজী হয়ে গেল। শিয়াল তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। চলতে চলতে একেবারে সিংহের গুহাটার কাছে এসে পড়ল। কোমর-ভাঙ্গা সিংহমামা সেই গাধার পিঠে থাবা বসাতে যাবে, অমনি লম্বকর্ণ দেখতে পেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

শিয়াল বলল, 'মামা তোমার হল কি? সামান্য একটা গাধাকেও মারতে পার না! দেখছি উপোস করেই মরতে হবে।'

সিংহ বলল, 'রাগ করিস নে ভাগ্নে। প্রস্তুত ছিলাম না, তাই থাবাটা ফস্‌কে গেল। এবার থেকে তৈরী হয়ে থাকব, আবার যা, অন্য কোন প্রাণী নিয়ে আয় তো।'

শিয়াল বলল, 'দেখি কি করতে পারি। আমরা কেবল চেষ্টা করতে পারি, ফলাফল ভগবানের হাতে।'

শিয়াল আবার গেল সেই লম্বকর্ণের কাছে। দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে লম্বকর্ণ বলল, 'বেশ ভাই, বেশ! কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে আমায়? একটা থাবা আমার পিঠে পড়েছিল আর কি! আয়ুর জোর ছিল, তাই বেঁচে এলাম।'

শিয়াল গম্ভীরভাবে বলল, 'তোমার মত বেরসিক আর দেখি নি। বিয়ের কনে হাতে মালা নিয়ে বসে রয়েছে। আর তার সখীরা একটু ঠাট্টা করতে এল তোমায়, তাই দেখেই পালিয়ে এলে! কী মনে করবে ওরা! বলবে, এ কেমন বর, ঠাট্টা বোঝে না!'

গাধা ভাবল, হয়তো তাই হবে। সে সাহস করে বলল, 'আমি কি আর ভয়ে চলে এসেছি? সময়টা বিয়ের পক্ষে ভালো ছিল না, তাই চলে এসেছি। চল, এখন আবার যাই। সত্যি, মেয়েরা কি মনে করবে!'

শিয়াল আর গাধা বিয়ের সম্বন্ধে কত গল্পগুজব করতে করতে আবার এল সিংহের গুহার কাছে।

এবার সিংহ প্রস্তুত হয়েই ছিল। গাধার পিঠে সে এমনি এক থাবা বসিয়ে দিল যে, সেই থাবাতেই গাধার ইহজন্মের বিয়ের সাধ ঘুচে গেল! ছটফট করতে করতে গাধাটা মরে গেল।

সিংহ বলল, 'ভাগ্নে, অনেক দিন পর খাবার পাওয়া গেল; আমি স্নান-আহ্নিক সেরে আসি। তুমি ততক্ষণ একে পাহারা দাও।'

—'যে আজ্ঞে।'

এই বলে শিয়াল গাধার মৃতদেহটা পাহারা দিতে লাগল। সিংহ গেল স্নান করতে।

পাহারা দিতে দিতে শিয়াল আর লোভ সামলাতে পারল না। খিদেও পেয়েছিল তার খুব। সে গিয়ে প্রথমে গাধার কান দুটো, পরে বুকটা কামড়ে খেয়ে ফেলল।

সিংহ ফিরে এসে দেখে গাধাটার কান আর বুক কে খেয়ে ফেলেছে! রেগে গিয়ে সে বলল শিয়ালকে, 'ওরে মূর্খ, তুই আমার খাদ্য উচ্ছিষ্ট করেছিস! তোকে এর শাস্তি পেতে হবে!'

শিয়াল বলল, 'মামা, তুমি মিথ্যে আমায় দোষ দিচ্ছ। বোধ হয় এই বোকা গাধাটার কান আর বুক ছিল না। বিপদ জেনেও আবার যে আসে, তার কি কানবুক থাকে?'

সিংহ বিশ্বাস করল তার যুক্তি। বলল, 'তা বটে, ঠিক বলেছিস।'

গল্প শেষ করে বানর বলল, 'ওহে কুমীর, তুই আমার সঙ্গে কপটাচরণ করেছিস, তোর সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব কিসের? তবু,

বোকামি করে আমার কাছে তোর মনের কথা বলে, আর আমার মিথ্যে কথা বিশ্বাস করে আমার উপকারই করেছিস। লোকে বলে, যে মূর্খ প্রতারক নিজের স্বার্থহানি করে সত্য কথা বলে, যুধিষ্ঠিরের মত তার স্বার্থ নষ্ট হয়!'

কুমীর জিজ্ঞাসা করল, 'যুধিষ্ঠিরের কি হয়েছিল?'

বানর বলতে লাগল 'সত্যবাদী যুধিষ্ঠির'-এর কাহিনী।

সত্যবাদী যুধিষ্ঠির

যুধিষ্ঠির কুমোরের কাজ করত। তার ঘরে মাটির হাঁড়ি, কলসী ও সরার অভাব ছিল না।

একদিন অন্যমনস্ক হয়ে চলতে গিয়ে যুধিষ্ঠির পড়ে গেল একটা সরার উপর। পড়ে গিয়ে তার কপালটার অনেকখানি কেটে গেল।

ঔষধপত্র না লাগাবার ফলে কাটা জায়গাটায় ঘা হয়ে গেল। অনেক-দিন পর তার ঘাটা শুকিয়ে গেলেও একটা বড় রকমের দাগ রয়ে গেল।

একদিন যুধিষ্ঠির রাজবাড়ির কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। রাজামশাইর নজরে পড়ে গেল যুধিষ্ঠির। তার কপালে ক্ষতচিহ্ন দেখে রাজা মনে করলেন, এ-লোকটা নিশ্চয় কোন বীর যোদ্ধা হবে। তাই রাজা তাকে ডাকিয়ে বললেন, 'হে বীর, আমি তোমায় রাজবাড়িতে রাখতে চাই। তুমি এখানেই থাক অন্যান্য বীরের সঙ্গে।'

যুধিষ্ঠির কৃতার্থ হয়ে গেল। সেই থেকে সে রাজবাড়িতে থাকে। অন্যান্য বীর তাকে ঈর্ষা করত খুব। তারা বলল, 'একে তো বীর বলে মনে হয় না, বীরের কোন চাল-চলন বা লক্ষণ তো দেখি না এর মধ্যে!' তখন সকলে মিলে স্থির করল যে, একটা নকল যুদ্ধের মহড়া করে ওর বীরত্ব পরীক্ষা করবে।

রাজামশাই ছিলেন যুধিষ্ঠিরের বড় হিতৈষী। তিনি ভাবলেন, একবার যুধিষ্ঠিরকে ডেকে ওর বীরত্বের কাহিনীগুলো শুনে প্রচার করে দিই, নইলে একে অন্য বীরপুরুষেরা সহজেই জয় করে ফেলবে।

রাজা যুধিষ্ঠিরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বীর যুধিষ্ঠির, তুমি কোন্ কোন্ যুদ্ধ করেছ? কোন্ কোন্ যুদ্ধে জয়লাভ করেছ?'

যুধিষ্ঠির বলল, 'আজ্ঞে, আমি তো কখনও যুদ্ধ করি নি, মহারাজ!'

রাজা অবাক হয়ে বললেন, 'কর নি! সে কী! বড় বীর মনে করে তোমায় আমার প্রাসাদে থাকতে দিলাম!...আচ্ছা তোমার কপালের ক্ষতচিহ্নটা কিসের? কোনও যুদ্ধে আহত হয়েছিলে বুঝি?'

যুধিষ্ঠির বলল, 'মহারাজ, কপালের দাগটার কথা বলছেন? একটা মাটির সরার উপর পড়ে গিয়ে কপালটা কেটে গিয়েছিল, এ তারই দাগ।'

রাজা লজ্জা পেয়ে বললেন, 'কী ভুলটাই করেছি তোমায় মস্ত একটা বীর মনে করে! যা হোক, যা হবার হয়ে গেছে। তুমি এখনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যাও, তোমার সত্যিকারের পরিচয় পেলে অন্য বীরেরা তোমায় মেরেই ফেলবে।'

যুধিষ্ঠির আফশোস করতে করতে ভাবল, সত্যিকারের পরিচয়টা রাজাকে না দিলেই ভালো হত। তবু সে সাহস করে বলল, 'মহারাজ, আমি কম বীর নই, একবার আমায় পরীক্ষা করুন।'

রাজা বললেন, 'যুধিষ্ঠির, তোমার পরিচয় যা পেয়েছি, তা-ই যথেষ্ট। বীরত্বের পরিচয় আর নিয়ে কাজ নেই। এখন সসম্মানে পলায়ন কর। সিংহের ছানাদের সঙ্গে কি আর শিয়াল-ছানা থাকতে পেরেছিল? তাকেও পালাতে হয়েছিল।'

যুধিষ্ঠির বলল, 'সে আবার কি ঘটনা মহারাজ?'

রাজা তখন বলতে লাগলেন 'শিয়ালছানার বড়াই'-এর গল্প।

শিয়ালছানার বড়াই

একবার এক সিংহ শিকার করতে গিয়ে সারাদিন ঘোরাফেরা করল। কোন শিকারই পেল না সে। সন্ধ্যার কাছাকাছি ক্লান্ত হয়ে সে ফিরে আসছে আপন গুহায়, এমন সময় শিয়ালের একটি বাচ্চা দেখতে পেল। সিংহ তাকেই ধরে নিয়ে এল।

সিংহী বলল, 'এ কী এনেছ? এ যে দেখছি একটা শিয়ালের বাচ্চা! সুন্দর বাচ্চা তো!'

সিংহ বলল, 'সুন্দর বলেই তো একে মারতে পারলাম না। তা ছাড়া, শাস্ত্রে আছে, স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণ আর শিশু—কখনও এদের বধ করতে নেই।'

সিংহী বলল, 'বাচ্চাটাকে আমি পুষব। সে হবে আমার বাচ্চা দুটোর দাদা। আমি একসঙ্গে এদের পালন করব।'

তিনটি ছানা একসঙ্গে বড় হতে লাগল। ক্রমে তারা মায়ের কোল ছেড়ে গুহার বাইরে, গুহার বাইরে থেকে দূর বনে খেলে বেড়াতে লাগল। ছোটখাট শিকার পেলে তারা তাড়া করে শিকারে হাত পাকায়।

একদিন সিংহের ছানা দুটি একটা হাতীকেই আক্রমণ করে বসল। শিয়ালছানা বলল, 'ওরে পালিয়ে আয়, হাতীকে আক্রমণ করিস নে। মারা যাবি।'

বড়দার কথায় সিংহের ছানা দুটি রাগে গরগর করতে করতে পালিয়ে এল। ঘরে ফিরে এসে মায়ের কাছে নালিশ করল তারা, 'বড়দার জন্যেই এত বড় শিকারটা আজ হাতছাড়া হয়ে গেল। আমরা কিন্তু আর বড়দাকে শিকারে নিয়ে যাব না।'

সিংহী সব শুনে শিয়ালছানাকে বলল, 'বাছা, ওদের শিকারে আর বাধা দিও না। তুমি না হয় দূরেই থেকো।'

সিংহীর কথা শুনে শিয়ালছানার পৌরুষে আঘাত লাগল। সে বলল, 'আমি কি ওদের চেয়ে কম শিকারী নাকি! আমি কি শিকার করতে পারি না—না, শিকার করতে জানি না?'

সিংহী বলল, 'থাক, ঢের হয়েছে বাপু, স্বীকার করি বটে যে তোমায় দেখতে সুন্দর এবং তোমার বুদ্ধিও আছে বেশ। তবু বলি,

তুমি যে-বংশে জন্মেছ, সে-বংশে কেউ হাতী শিকার করে নি। তুমি তোমার স্বজাতীয়দের কাছে ফিরে যাও, নইলে বিপদ ঘটতে পারে।'

গল্প শেষ করে বানর বলল, 'এই জন্যই বলেছি যে, যে-ব্যক্তি নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে সত্যকথা বলে, তার এই পরিণাম হয়। তুই যদি তোর মনের কথা না বলতিস, তবে অনায়াসে আমার হৃৎপিণ্ড খেতে পারতিস। গাধার মতই বোকামি করেছিস তুই।'

কুমীর জানতে চাইল গাধা কি বোকামি করেছিল। তখন বানর বলতে লাগল 'সিংহ না গাধা'-র গল্প।
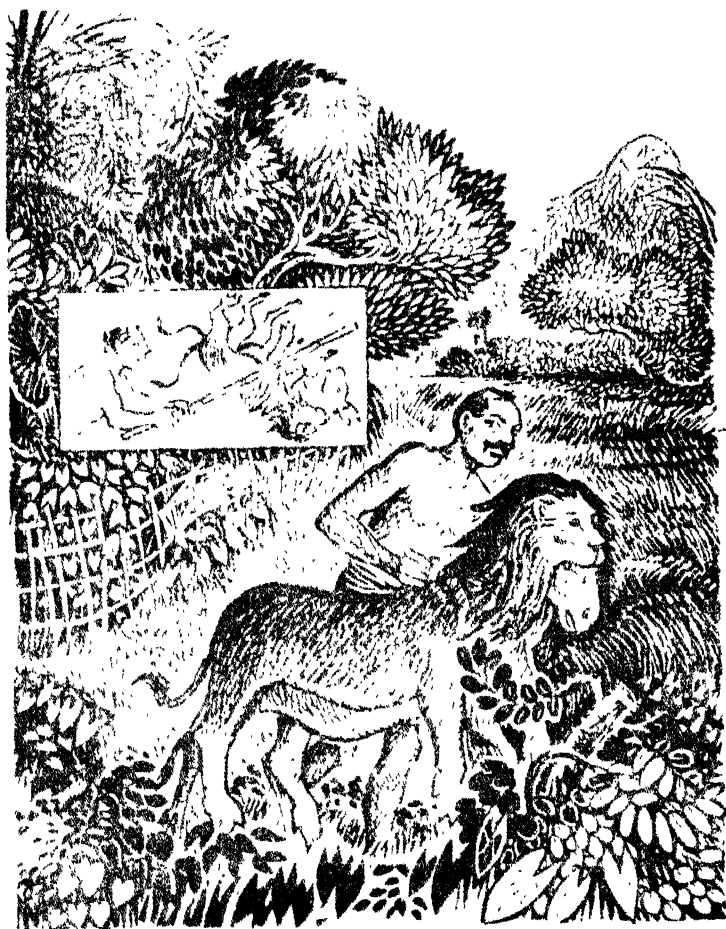
সিংহ না গাধা

গাধা না হলে ধোপাদের কাজ চলে না। তাদের কাপড়ের বোঝা বইতে গাধা যেমন পারে, তেমন অন্য কোন পশুই পারে না। তাই বহু ধোপারই কয়েকটা করে গাধা থাকে।

এক দেশে এক গরীব ধোপা ছিল। তার ছিল মাত্র একটা গাধা। কিন্তু সেই একটা গাধাকেই সে পুষতে পারত না। গাধাটার খাটুনি ছিল খুব, কিন্তু উপযুক্ত খাদ্য তার জুটত না।

ধোপার নিজের এমন জমি-জমা ছিল না, যাতে গাধাটা চরে খেতে পারে। তাই পরের মাঠে ময়দানে সে অল্প অল্প ঘাস খেয়ে কোনমতে বেঁচে থাকত।

অল্প আহারে গাধাটার শরীর গেল রোগা হয়ে। তখন ধোপা চিন্তা করল, হায়, আমার একটিমাত্র গাধা! তাও বুঝি শুকিয়ে মরবে।

অনেক চিন্তাভাবনা করে সে একটা চমৎকার মতলব বার করল। ধোপার ছিল একটা সিংহের চামড়া। সে রোজ সন্ধ্যায় গাধাটার গায়ে সিংহের চামড়াটা ভালো করে এঁটে দিয়ে তাকে অপরের ফসলের জমিতে ছেড়ে দিয়ে আসত। চাষীরা তাকে সিংহ মনে করে ভয় পেয়ে আর তার কাছে ঘেঁষত না।

সারা রাত ধরে গাধাটা অপরের ফসল খেত, ভোরবেলায় ধোপা গিয়ে তাকে নিয়ে আসত।

এইভাবে দিন যায়, মাস যায়। খুশিমত খেয়ে খেয়ে গাধার শরীরটা ক্রমে বেশ মোটাসোটা হয়ে উঠল।

একদিন সিংহচর্মে ঢাকা সেই গাধাটা এক চাষীর ফসলের জমিতে ঢুকেছে, এমন সময় দূরে অন্য কতকগুলো গাধা চিৎকার করে ডেকে উঠল। তা শুনে গাধাটাও তার জাতীয় স্বভাব ভুলতে না পেরে তাদের সুরে সুর মিলিয়ে চিৎকার জুড়ে দিল।

আর যায় কোথায়! চাষীর বাড়ি ছিল কাছেই। ক্ষেতে গাধা ঢুকেছে জানতে পেরে সে এসে দেখল, সেই 'সিংহটাই' গাধার মত চিৎকার করছে।

বুদ্ধিমান চাষী সহজেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল। সে ছুটে

এসে, মনের ঝাল মিটিয়ে এমন মার মারল যে, সেই মারের চোটে সিংহচর্মে ঢাকা গাধা মারা গেল।

বানর তার গল্প বলা শেষ করল।

এমন সময় অন্য একটা কুমীর এসে সেই বোকা কুমীরটাকে সংবাদ দিল, 'ওহে তুমি এখানে বসে আছ, আর ওদিকে অভিমানে তোমার স্ত্রী মারা গেছে। আর, অন্য একটা জানোয়ার এসে তোমার ঘর দখল করে বসেছে।'

খবরটা শুনে সেই কুমীর হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। অনেক-ক্ষণ ধরে সে কাঁদল। তাকে কাঁদতে দেখে বানরেরও বড় দুঃখ হল। সে তাকে নানা কথায় সান্ত্বনা দিল।

কুমীর বলল, 'বন্ধু বানর, এখন আমি কি করি? কি করা উচিত, তুমিই বলে দাও।'

বানর বলল, 'আমার কথা যদি শুনিস, তবে বলি শোন্, কান্না-কাটি রেখে আগে গিয়ে ঘরটা দখল কর। সেই জানোয়ারটার সঙ্গে গিয়ে যুদ্ধ কর। যুদ্ধ করে মারা গেলে স্বর্গে যাবি, আর বেঁচে থাকলে প্রাণ, ঘর ও যশ, সবই পাবি। শত্রুকে জয় করবার অনেক কৌশল আছে। পণ্ডিতেরা বলেন—উত্তমকে প্রণিপাতে, বলবানকে ভেদনীতি দ্বারা, নীচ ব্যক্তিকে সামান্য অর্থ দিয়ে, আর সমান সমান শত্রুকে শক্তি দিয়ে আয়ত্ত করতে হয়। এই উপায়েই মহাচতুরক শিয়াল সকলকে আয়ত্ত করতে পেরেছিল।'

কুমীর জিজ্ঞাসা করল, 'তা আবার কি করে সম্ভব হয়েছিল?'

বানর বলল, 'তবে বলি, শোন্।'

এই বলে সে বলতে লাগল 'বুদ্ধিমান শিয়াল'-এর গল্প।

বুদ্ধিমান শিয়াল

গহন বনের মধ্যে একটা হাতী মরে পড়ে ছিল। সন্ধান পেয়ে এক শিয়াল ছুটে এল। পাছে অন্য কেউ দাবি করে বসে, তাই মরা হাতীটার উপর গিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

হাতীর মগজ নাকি বড় সুস্বাদু। আজ সে প্রথমে মগজটাই খাবে।

এই ভেবে শিয়াল গিয়ে মরা হাতীটার মাথায় জোরে এক কামড় বসিয়ে দিল। কড়মড় করে উঠল তার দাঁতগুলো, হাতীর চামড়া কিন্তু সে-কামড়ে ফুটো হল না একটুও।

বুড়ো হাতীর শক্ত আর পুরু চামড়ায় দাঁত ফুটানো কি আর শিয়ালের কর্ম? সে ভাবল, অন্য কোন জন্তুকে দিয়ে কৌশলে সে চামড়াটা ছিঁড়িয়ে নেবে।

পিছনে ভীষণ গর্জন শুনে শিয়াল তাকিয়ে দেখল, এক ভীষণাকার সিংহ সেই দিকেই আসছে।

সিংহকে দেখেই শিয়াল প্রণাম করে বলল, 'মহারাজ, দাস একটি প্রাণী বধ করেছে। আপনার সেবায় লাগলে সে কৃতার্থ হবে।'

সিংহ বলল, 'তোমার কথায় বড় খুশী হলাম। কিন্তু অন্যের নিহত পশু আমি খাই না।'

এই বলে সিংহ চলে গেল!

সিংহ চলে যাওয়ার একটু পরেই খস্‌খস্‌ শব্দ শুনে শিয়াল দেখল, পা টিপে টিপে এক বাঘ আসছে তার দিকেই।

শিয়াল চিন্তা করল, বড় লোভী এই বাঘ। একে তাড়াতে না পারলে সে সবটাই সাবড়াবে।

তাই শিয়াল নমস্কার করে বলল, 'বাঘমামা, যাচ্ছ কোথায়? সব ভালো তো?'

বাঘ বলল, 'ভালো বৈ কি! ভাগ্নে দেখছি বেশ বড়-সড় একটা হাতী মেরেছ!'

বাঘের মুখে লালা ঝরতে লাগল। সে আরও বলল, 'হাতীর মাংস বড় সুস্বাদু। খেয়েছিলাম বটে গত বছর।'

সে আরও কি বলতে যাচ্ছিল। শিয়াল বাধা দিয়ে বলল, 'সেই জন্যই তো পাহারা দিচ্ছি এটাকে। সিংহমশাই মেরে রেখে স্নান করতে গেছেন। এসেই খাবেন, আমি হয়তো একটু প্রসাদ পাব।'

তা শুনে বাঘ বলল, 'তাই নাকি! আগে বলতে হয়, ভাগ্নে। কী সর্বনাশ! দেখলে আর উপায় আছে?'

এই বলে সে সরে পড়ল।

শিয়াল মনে মনে বলল, 'দুটোকে তো তাড়ালাম। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ চলবে? মরা হাতীর চামড়া ছিঁড়ব কেমন করে?'

এই সময় এক নেকড়ে বাঘ কান খাড়া করে চারদিকে তাকাতে তাকাতে এল। তাকে দেখেই মনে হচ্ছিল, সে খুব ক্ষুধার্ত। শিয়াল ভাবল, একে দিয়ে কার্যোদ্ধার করতে হবে।

শিয়াল তাকে ডেকে বলল, 'দাদা, বলি যাচ্ছ কোথায়? খাবারের সন্ধান পেয়েছ নাকি কোথাও?'

নেকড়ে॥ খাবারের কথা বলে আর খিদের জ্বালা বাড়িয়ে দিও না, ভাই! সকাল থেকে ঘুরছি, একটা খরগোশ অবধি পাই নি।

শিয়াল॥ যা দিনকাল পড়েছে! কারো করে খেতে হবে না দেখছি।

নেকড়ে॥ তোমার কি চিন্তা? বেশ তো একটা শিকার বাগিয়েছ!

শিয়াল॥ হায় আমার পোড়াকপাল! সিংহমশাই একে মেরে রেখে এইমাত্র স্নান করতে গেছেন। স্নান করবেন, আহ্নিক করবেন, জপতপ কত কিছু করবেন, তারপর কখন যে আসবেন, তার কিছু ঠিক আছে? এসে তিনি কিছু মুখে দিবেন, তারপর আমি একটু প্রসাদ পাব।

নেকড়ে লুব্ধ দৃষ্টিতে হাতীটার দিকে তাকাচ্ছিল। শিয়াল মনে মনে বলল, এই সুযোগ। প্রকাশ্যে বলল, 'তোমায় খুবই ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে।'

নেকড়ে॥ তবে আর বলছি কি! খিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে।

শিয়াল॥ এক কাজ কর দাদা, আমি পাহারায় থাকি, তুমি হাতীর খানিকটা খেয়ে যাও। সিংহকে আসতে দেখলে আমি তোমায় সাবধান করে দেব, তুমি পালিয়ে যাবে। না খেতে পেয়ে তুমি কষ্ট পাবে, এ কি আমি সহ্য করতে পারি?

নেকড়ে॥ সিংহের মুখের গ্রাস খাব আমি? দরকার নেই ভাই। আমার ঘাড়ে তো আর দুটো মাথা নেই! শাস্ত্রে আছে—যে-খাদ্য খাবার শক্তি আছে, যা খেলে হজম হয়ে যায়, যা পুষ্টিকর অথচ খেলে কোন বিপদ হয় না, কল্যাণকামী লোক তা-ই খাবে। সিংহের মুখের গ্রাস খেয়ে কেউ কখনও হজম করতে পারে?

শিয়াল॥ দেখ দাদা, বলতে গেলে আজ তুমি আমার অতিথি। অতিথিকে অভুক্ত অবস্থায় বিদায় দিয়ে আমি কি পাতকের ভাগী হব! আমি বলছি, তুমি অসংকোচে খেয়ে যাও। বিপদের ঝুঁকি সব আমি নেব।

নেকড়ে॥ একান্তই যখন বলছ ভাই, বেশ, খানিকটা খেয়েই যাই। তুমি আমায় সতর্ক করে দিও ঠিক সময়ে।

এই বলে সেই নেকড়ে তার শক্ত ও ধারাল দাঁতগুলি দিয়ে টেনে টেনে হাতীর শক্ত চামড়া ছিঁড়ে ফেলল।

শিয়াল খানিকটা দূরে গিয়ে পাহারা দেবার ভান করতে লাগল, আর আড়চোখে নেকড়ের কাজ লক্ষ্য করতে লাগল।

হাতীর পিঠের চামড়া প্রাণপণ বলে ছাড়িয়ে ফেলল নেকড়ে। এবার সে মাংস খেতে যেই হাঁ করে কামড় বসাতে যাবে, অমনি শিয়াল বলে উঠল, 'দাদা, পালাও—পালাও, সে আসছে'...

শিয়ালের কথা শুনে বেজায়রকম ঘাবড়ে গিয়ে নেকড়ে এমন ছুট

দিল যে, সে একেবারেই সেই বন ছেড়ে অন্য বনে চলে গেল, পিছনের দিকে ফিরে তাকাল না একটিবারও।

বানরের কথামত কুমীর গিয়ে তার বেদখলকারী সেই জন্তুটার সংগে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। যুদ্ধে জয়লাভ করে সে নিজের ঘর আবার দখল করে নিল।

এর পর আরম্ভ হল পঞ্চম তন্ত্রের 'অপরীক্ষিতকারক'-এর কাহিনী।

॥ চতুর্থ তন্ত্র সমাপ্ত ॥

পঞ্চতন্ত্র : পঞ্চম তন্ত্র : অপরীক্ষিত কারক

মণিভদ্র জাতিতে শ্রেষ্ঠী বা বণিক। তার পূর্বপুরুষ খুব বড়-লোক ছিলেন। কিন্তু পূর্বপুরুষের সেই ধন-দৌলত আর জমি-জমার কিছুই তখন অবশিষ্ট ছিল না। ব্যবসায়-বাণিজ্য করেও সে

তার অবস্থার উন্নতি করতে পারে নি। ভাগ্য যার প্রতি বিমুখ, তার জীবনে উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়?

মণিভদ্র যদি বড়লোকের বংশে জন্ম না নিত, তবে হয়তো এতেই সে সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু মণিভদ্র তার দীনহীন অবস্থা সহ্য করতে পারল না। কোন উপায় না দেখে সে ঠিক করল, সে আত্মহত্যা করবে।

রাতে মণিভদ্র এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখল। সে দেখল স্বয়ং ভগবান পদ্মনাভ তাকে বলছেন, 'মণিভদ্র, আত্মহত্যা কোরো না ; আত্মহত্যা মহাপাপ। তোমার পূর্বপুরুষগণ আমায় পেয়েছিলেন। সেই পুণ্যের বলে তুমিও আমায় পাবে। আগামীকাল সকালে আমি এক ক্ষপণকের (বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর) বেশে তোমার কাছে যাব। তুমি একটা লাঠি দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করবে। আমি তখনই স্বর্ণময় হয়ে যাব। সেই সোনা বিক্রি করে তুমি লাভবান হবে, আবার ঐশ্বর্য ফিরে পাবে।'

এই বলে পদ্মনাভ মিলিয়ে গেলেন।

মণিভদ্র ঘুম থেকে উঠে স্বপ্নের কথাই ভাবতে লাগল। তার মন সন্দেহ আর আশায় দোলায়িত হতে লাগল। সত্যই কি এতদিনে পদ্মনাভ মুখ তুলে চাইলেন? অথবা এ কি শুধু স্বপ্ন? স্বপ্ন মায়াময়, মিথ্যা। আবার মনে হল, দৈব অনুকূল হলে সবই হতে পারে। 'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্', দৈবের চেয়ে আর বল নাই।

রাত্রি প্রভাত হল। অধীর আগ্রহে মণিভদ্র প্রতিটি মুহূর্ত গুনতে লাগল। প্রতিটি শব্দে মনে হতে লাগল, ঐ বুঝি তিনি আসছেন! কই ক্ষপণকের বেশধারী পদ্মনাভের তো দেখা নেই!

বেলা প্রায় এক প্রহর হতে চলল। এমন সময় নাপিত এল মণিভদ্রের দাড়ি কামাতে। দাড়ি কামাতে বসেও মণিভদ্র উন্মুখ হয়ে

রইল। উৎকর্ণ হয়ে প্রতিটি শব্দ সে শুনতে লাগল। হঠাৎ মণিভদ্রের চোখের সামনে ভেসে উঠল এক সন্ন্যাসীর মূর্তি।

বিশ্বাস করতে পারল না মণিভদ্র। তারপর তাঁকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে সেই সন্ন্যাসীর মাথায় ভীষণ জোরে লাঠি দিয়ে আঘাত করল। আঘাত পেয়ে সন্ন্যাসী স্বর্ণময় হয়ে পড়ে গেল। আনন্দে উৎসাহে মণিভদ্রের চোখে জল এল।

বেচারা নাপিত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার জীবনে সে এমন ঘটনা কখনও দেখেও নি, শোনেও নি। তাকে বিস্মিত হতে দেখে মণিভদ্র বলল, 'নাপিত ভাই, এই ঘটনার কথা যেন কাউকে বলো না। আমি তোমায় কিছু টাকা দিচ্ছি।'

বাড়িতে এসে কোন কাজেই নাপিতের মন বসল না। তার মনে কেবল এক চিন্তা—কী দেখলাম! ক্ষপণকের মাথায় আঘাত করলেই সে সোনা হয়ে যাবে? সারাদিন সেই চিন্তায় নাপিত ডুবে রইল। সারাদিন চিন্তা করে সে ঠিক করল, সে-ও ক্ষপণককে মেরে সোনা তৈরী করবে।

ক্ষপণকেরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তাঁরা যে মঠে থাকেন তাকে বলে 'বিহার'। নাপিত বিহারে গিয়ে প্রধান ক্ষপণককে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইল। প্রধান ক্ষপণক তাকে আশীর্বাদ করে তার মঙ্গল কামনা করলেন। নাপিত বলল, 'প্রভু, আমি আপনাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।'

প্রধান ক্ষপণক বললেন, 'বৎস, ক্ষপণকদের কারো গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে নেই। আমরা প্রয়োজনমত ভিক্ষা করে জীবনধারণ করি, তার বেশি কিছু চাই না।'

নাপিত সবিনয়ে বলল, 'প্রভু, আমি তা জানি। আমি আপনাদের

জন্য কিছু কিছু জিনিস দান করতে চাই। কাল সকালে গিয়ে সেই দান গ্রহণ করলে নিজেকে ধন্য মনে করব।'

প্রধান ক্ষপণক রাজী হয়ে বললেন, 'তোমার আগ্রহ দেখে আমি রাজী হলাম।'

পরদিন সকালবেলায় ক্ষপণকেরা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে নাপিতের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। নাপিত তাঁদের অভ্যর্থনা করে একটা বড় ঘরে নিয়ে গেল। ক্ষপণকেরা ঘরে ঢুকলে নাপিত সব দরজা, জানালা বন্ধ করে দিল। তারপর গুপ্তস্থান থেকে একটা প্রকান্ড লাঠি বার করে ক্ষপণকদের মাথায় আঘাত করতে লাগল। নিরীহ অহিংস ক্ষপণকেরা আহত হয়ে চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলেন। নাপিত কোন দিকে লক্ষ্য না করে বেপরোয়াভাবে আঘাতের পর আঘাত করেই চলল।

ক্ষপণকদের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা এবং শান্তিরক্ষক রাজ-পুরুষেরা ছুটে এল। দরজা ভেঙে সেই ঘরে ঢুকে তারা নাপিতের হাত থেকে ক্ষপণকদের উদ্ধার করল, আর নাপিতকে করল বন্দী।

রাজপুরুষেরা নাপিতকে তার এই নিষ্ঠুর কাজের হেতু কি জিজ্ঞাসা করলে নাপিত মণিভদ্রের কথা বলল। তখন মণিভদ্রকে ডাকিয়ে এনে তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি সে কোন ক্ষপণককে মেরেছিল কি না। মণিভদ্র সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। তখন রাজ-পুরুষেরা বললেন, 'ওহে নাপিত, তুমি অপরীক্ষিতকারক, তুমি কোন কাজের হেতু না জেনেই অনুরূপ কাজ করতে গিয়ে এতগুলো নিরীহ ক্ষপণককে হতাহত করেছ। অতএব তোমাকে শূলে দিলেই উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। নকুলের জন্য ব্রাহ্মণপত্নীর সন্তানের মত এখন আর সন্তাপ করে লাভ নেই।'

মণিভদ্র জিজ্ঞাসা করল, 'সে কিরকম?'

রাজপুরুষেরা তখন বলতে লাগলেন 'বিশ্বস্ত বেজী'-র গল্প।

বিশ্বস্ত বেজী

গরীব ব্রাহ্মণের একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে ছিল। ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতেন তাকে। সংসারে থাকবার মধ্যে তাঁদের ছিল এই একটি ছেলে, আর একটি বেজী। ছেলেটির

যেদিন জন্ম হয়, সেই দিনই বেজীটিও জন্মেছিল। জন্মের পর বেজীটির মা মরে গিয়েছিল। সেই থেকে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী ছেলের মত যত্নে বেজীটিকে পুষতেন।

একদিন ব্রাহ্মণী বললেন, 'আমি পুকুর থেকে জল নিয়ে আসি। তুমি খোকাকে দেখো।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমাকে আবার রাজবাড়ি যেতে হবে। তুমি সকাল সকাল এসো।'

ব্রাহ্মণী বললেন, 'আজ আর রাজবাড়ি গিয়ে কাজ নেই। তুমি থাক। আমি জল নিয়ে আসি।'

এমন সময়ে রাজবাড়ি থেকে লোক এল ব্রাহ্মণের কাছে। ব্রাহ্মণ তখনই ছুটলেন রাজবাড়ির দিকে।

ব্রাহ্মণী বেজীটিকে খোকার পাহারায় রেখে জল আনতে পুকুরে গেলেন। পুকুরে গেলেই পল্লীর স্ত্রীলোকদের ঘরে ফিরতে দেরি হয়। কেননা, সেখানে অন্য পাঁচজন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে দেখা হয়, সুখদুঃখের আলাপ হয়, পরচর্চা যে না হয়, এমন নয়। ব্রাহ্মণীরও তাই দেরি হয়ে গেল।

যখন মনে পড়ল যে, তিনি খোকাকে একলা রেখে এসেছেন, তখন তাঁর বড় ভাবনা হল, তাই তো, দেরি করে ফেলা ঠিক হয়নি! ভাবতে ভাবতে তিনি জোরে জোরে হাঁটতে লাগলেন। বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছেন, এমন সময় বেজীটা ছুটে এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কোলে উঠতে চাইলেই বেজীটা অমন করত।

আজ বেজীর ব্যবহারে ব্রাহ্মণী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ছেলেটাকে একলা ফেলে এসে আবার কোলে উঠতে চাইছিস লজ্জা করে না?'

ব্রাহ্মণীর কথা হয়তো বেজীটা বুঝতে পারে নি, কিন্তু সে তাঁর বিরক্ত মনোভাব বুঝতে পারল। তাই সে বিস্মিত হয়ে ব্রাহ্মণীর মুখের দিকে তাকাল।

বেজীর মুখের দিকে নজর পড়তেই ব্রাহ্মণী চিৎকার করে উঠলেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন, বেজীর পায়ে মুখে লেগে রয়েছে তাজা রক্ত!

—'হতভাগা বেজী, তুই আমার ছেলেকে খেয়েছিস!'

এই বলে তিনি জল-ভরা কলসীটা ফেলে দিলেন বেজীর উপর। অব্যক্ত যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল অবোলা প্রাণীটা। একটুখানি ছটফট করল সে, তারপর সব শেষ!

এদিকে ব্রাহ্মণী পাগলের মত ছুটে গেলেন ঘরের দিকে। ঘরে ঢুকে ব্রাহ্মণী অবাক হয়ে গেলেন! দেখলেন, খোকা নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে ঘুমাচ্ছে। আর তার পাশে একটা গোখরো সাপ টুকরো হয়ে পড়ে আছে। ব্রাহ্মণীর আর বুঝতে বাকী রইল না যে, বিশ্বস্ত বেজীটাই তার খোকাকে সাপের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তখন তাঁর আর অনুশোচনার শেষ রইল না।

এমন সময় ব্রাহ্মণও রাজবাড়ী থেকে ফিরে এলেন। তাঁকে দেখে ব্রাহ্মণীর রাগ গিয়ে পড়ল তাঁরই উপর। তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন, ''তুমি লোভবশতঃ চলে গেলে বলেই তো আজ এমন অঘটন ঘটে গেল! ছেলেটা যদিও বা সাপের কামড় থেকে বাঁচল, বেজীটা আমার বুদ্ধির দোষে প্রাণ হারাল। এসবের জন্য তোমার লোভই দায়ী। অতিলোভ করতে গেলে সেই চারজন ব্রাহ্মণপুত্রের গল্পের মত অবস্থা হয়।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমি একটু লোভীই বটে। কিন্তু সেই চারজন ব্রাহ্মণপুত্রের গল্পটা কি বল শুনি।'

তখন ব্রাহ্মণী বলতে লাগলেন 'অতি লোভ ভালো নয়'—এই উপদেশপূর্ণ গল্পটি।

—

অতিলোভ ভালো নয়

একবার চার ব্রাহ্মণপুত্র বিদেশে গিয়েছিল অর্থ উপার্জন করতে। তারা ছিল পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

পথে শিপ্রা নদীর তীরে এক যোগী পুরুষের সঙ্গে তাদের দেখা

হল। তারা তাঁকে প্রণাম করে বলল, 'দেব, আপনি সিদ্ধপুরুষ। আমরা উপার্জন করতে বেরিয়েছি। আপনি আমাদের পথ বলে দিন।'

যোগী পুরুষ তাদের কথাবার্তায় সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'এই চারটি প্রদীপ চারজন হাতে নিয়ে চলতে থাক। সোজা উত্তরে হিমালয়ের দিকে যাও। যার হাত থেকে যেখানে প্রদীপ পড়ে যাবে, সেই স্থান খুঁড়লেই ধনের সন্ধান পাবে।'

চারবন্ধু প্রদীপ হাতে নিয়ে চলতে লাগল। চলতে চলতে এক বন্ধুর হাত থেকে একটা প্রদীপ পড়ে গেল। তখন চারবন্ধু মিলে মাটি খুঁড়ে এক তামার খনির সন্ধান পেল। যার হাত থেকে প্রদীপ পড়ে গিয়েছিল, সে বলল, 'বন্ধুগণ, এস আমরা এই তামা নিয়েই দেশে ফিরে যাই। তামা বিক্রি করে আমরা অনেক টাকাপয়সা পেতে পারি।'

অন্য বন্ধুরা বলল, 'তুমি তা হলে তামা নিয়েই সন্তুষ্ট থাক। আমরা দেখি ভাগ্যে আরও কী আছে।'

প্রথম বন্ধু তামা নিয়েই দেশে চলল। অপর তিনবন্ধু প্রদীপ হাতে নিয়ে আরও উত্তরে এগিয়ে যেতে লাগল।

হঠাৎ দ্বিতীয় বন্ধুর হাত থেকে তার প্রদীপটা পড়ে গেল। তখন তিনবন্ধু মিলে সেই স্থান খুঁড়ল। সেখানে ছিল রুপোর খনি। বন্ধুটি বলল, 'ওহে, এস আমরা এই রুপো নিয়ে দেশে ফিরে যাই। রুপোর অনেক দাম। রুপো বেচে আমরা বড়লোক হব।'

কিন্তু তার অপর দুইবন্ধু রাজী হল না। তারা বলল, 'রুপো নিয়ে তুমি ঘরে যেতে পার। আমরা আরো এগিয়ে যাব।'

অগত্যা দ্বিতীয় বন্ধুটি রুপো নিয়েই দেশে ফিরল। অন্য দুই-বন্ধু প্রদীপ হাতে নিয়ে চলতে লাগল।

চলতে চলতে তৃতীয় বন্ধুর হাত থেকে প্রদীপটা মাটিতে পড়ে

গেল। দুই বন্ধুতে প্রাণপণে পরিশ্রম করে খোঁড়াখুঁড়ি করে পেল সোনার খনির সন্ধান। সোনার খনি পেয়ে বন্ধুটি উল্লসিত হয়ে অপর বন্ধুকে বলল, 'বন্ধু, তোমার আর এগিয়ে কাজ নেই। সোনার চেয়ে দামী আর কি হতে পারে? এস, আমরা সোনা নিয়েই দেশে ফিরি।'

কিন্তু চতুর্থ বন্ধুটি কেবল সোনাতেই সন্তুষ্ট নয়। সে বলল 'তামার পর রূপো, তারপর সোনা, এবার হয়তো মানিক পাব। অতএব আমি আরও এগিয়ে যাব। দেখি, ভাগ্যে কি আছে।'

তৃতীয় বন্ধুটি বলল, 'তুমি যদি আরও এগিয়ে যেতে চাও, তবে আমি বাধা দেব না, কিন্তু আমার মনে হয়, লোভ থাকা ভালো, কিন্তু বেশি লোভ থাকা ভালো নয়। তুমি বড় বেশি লোভী।'

চতুর্থ বন্ধুটি সোনার চেয়ে দামী কিছু পাবার আশায় আরও অনেক দূর এগিয়ে গেল। এমন সময় সে দেখতে পেল, একটি লোক সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মাথায় একটি চাকা বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে।

ব্যাপার দেখে চতুর্থ বন্ধুটি অবাক হয়ে গেল। কৌতূহলও তার কম হয় নি। তাই সে জিজ্ঞাসা করল, 'মহাশয়, আপনি কে? এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? মাথায় একটা চাকাই বা এমন ঘুরছে কেন?'

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই চাকাটি লোকটার মাথা থেকে এসে লোভী চতুর্থ বন্ধুটির মাথায় চেপে বসল। আর ঘর্‌ঘর্‌ করে ঘুরতে লাগল।

সে চিৎকার ক'রে উঠল, 'এ কী! চাকাটা আমার মাথায় কেন এল? উঃ কী ভার! কী যন্ত্রণা!'

তার এমন অবস্থা হল যে, সে আর নড়তে-চড়তে পারে না।

তখন সেই লোকটি বলল, 'ভাই, অতিলোভ করে এতদূর না এলেই ভালো করতে। তোমার মতই লোভের বশবর্তী হয়ে প্রদীপ

হাতে নিয়ে আমিও এসেছিলাম। সে কত কালের কথা! আজ তুমি এসে আমায় মুক্তি দিলে। তোমাকে এখানে এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বছরের পর বছর, যতদিন না তোমার মত লোভী অন্য কেউ এসে তোমায় মুক্ত করে।'

বন্ধুটি বলল, 'এখানে আমি একা থাকব কেমন করে? খাবই বা কি?'

লোকটি বলল, 'লোভ-বৃক্ষের ফল ছাড়া আর কি খেতে চাও? ভাই, এ যক্ষের মায়াকানন। এখানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই। আছে শুধু অন্ধ অনুশোচনা।'

এই বলেই সে চলে গেল।

সেই লোকটি চলে গেলে একা দাঁড়িয়ে চতুর্থ বন্ধু অনুশোচনা করতে লাগল।

এমন সময় তৃতীয় বন্ধুটি (যে সোনা পেয়েছিল), তাকে খুঁজতে খুঁজতে সেইখানে এল। সে তার বন্ধুকে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'বন্ধু, তুমি কি পেলে?'

চতুর্থ বন্ধু সব খুলে বলল। বলল, 'বন্ধু, আমি অনুশোচনা আর যন্ত্রণা ছাড়া কিছুই পাই নি।'

তৃতীয় বন্ধু বলল, 'আমি আগেই জানতাম যে, এমনি একটা কিছু আছে তোমার ভাগ্যে। মরা সিংহকে বাঁচাবার মতই হয়েছে ব্যাপারখানা। বন্ধুর উপদেশ না শুনলে এমনই হয়, বিপদ তো হয়ই, লোকের কাছে হাস্যাস্পদও হতে হয়।'

চক্রধারী বন্ধু জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছিল সিংহকে বাঁচাতে গিয়ে?'

তখন তৃতীয় বন্ধু বলতে লাগল 'বিদ্বান আর বুদ্ধিমান'-এর গল্প।

বিদ্বান আর বুদ্ধিমান

চার ব্রাহ্মণপুত্রের মধ্যে মিত্রতা ছিল খুব। তাদের তিনজন ছিল শাস্ত্রজ্ঞ। নানারকম শাস্ত্র ও বিদ্যা তারা শিক্ষা করেছিল। শুধু তাই নয়, নিজেদের পাণ্ডিত্যে তাদের অহংকারও ছিল খুব। তারা

মনে করত, তাদের মত বিদ্বান, পণ্ডিত আর শাস্ত্রজ্ঞানী আর কেউ নেই।

সেই তিনজন শাস্ত্রজ্ঞানী ব্রাহ্মণপুত্র তাদের চতুর্থ বন্ধুটির জন্য লজ্জিত ছিল। সে তাদের মত শাস্ত্রজ্ঞ ছিল না, তাদের মত পুঁথি-পত্রও সে পড়ে নি, বড় বড় শাস্ত্রের ব্যাখ্যাও সে শোনে নি।

শাস্ত্রজ্ঞানহীন বন্ধুটি বলত, 'আমি শাস্ত্রজ্ঞানহীন বটে, কিন্তু তোমাদের মত বোকা নই। মোটা মোটা বই পড়ে আর জটিল শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনে শুনে তোমাদের বুদ্ধি চাপা পড়ে গেছে, তাই তোমরা পণ্ডিত হয়েও মূর্খ।'

পণ্ডিত বন্ধুরা বলত, 'তোমার মত শাস্ত্রজ্ঞানহীন লোকের পক্ষেই এমন কথা বলা শোভা পায়। আমাদের বুদ্ধি আছে কিনা কাজের সময়ে বুঝিয়ে দেব।'

একবার চার বন্ধুতে বেড়াতে গেল। অনেক দূরে বনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তারা তাদের পাণ্ডিত্য নিয়ে গর্ব করতে লাগল।

তারা বলল, 'আজ এখানেই আমরা আমাদের জ্ঞানের পরিচয় দেব। ঐ দেখ, মৃত জন্তুর হাড় পড়ে আছে। মনে হচ্ছে, এ কোন সিংহের হাড় হবে। আমরা মন্ত্রবলে এর হাড় জোড়া দেব, এর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করব।'

শাস্ত্রজ্ঞানহীন বন্ধুটি বলল, 'যদি এগুলো সত্যি সিংহের হাড় হয়ে থাকে, তবে এগুলো জোড়া দেওয়া বা সিংহকে বাঁচিয়ে দেওয়া মোটেই উচিত নয়। এতে বিপদের সম্ভাবনা আছে।'

তারা বলল, 'মূর্খেরাই সব কিছুতে ভয় পায়, জ্ঞানীরা অকারণ ভয় পায় না। অতএব আমরা একে বাঁচিয়ে তুলবই।'

শাস্ত্রজ্ঞানহীন বন্ধুটি বলল, 'পণ্ডিতমূর্খকে উপদেশ দিয়ে কোন

ফল হবে না জানি। তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর। আমি আপাততঃ গাছে উঠে প্রাণ বাঁচাই।'

এই বলে সে একটা গাছে উঠে পড়ল।

তখন তিন পণ্ডিত বন্ধু মিলে সেই মৃত সিংহটিকে প্রাণ দান করল।

প্রাণ পেয়ে সিংহটি আড়মোড়া ভেঙে উঠল। মনে হল, যেন সে ঘুম ভেঙে উঠেছে। তার প্রাণদাতাদের দিকে সে একবার বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাল। সে-দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র ছিল না, ছিল ক্ষুধিত সিংহের লুব্ধ দৃষ্টি।

তিন মূর্খ পণ্ডিত বলল, 'বৎস, আমরা তোমার জীবন দিয়েছি।'

সিংহ লাফ দিয়ে তাদের ঘাড়ে পড়ল এবং এক-একবার এক-একজনের ঘাড় ভাঙল! তারপর তাদের রক্ত চুষে খেতে লাগল। গাছের উপর সেই মূর্খ বন্ধুটি আতংকে শিউরে উঠল।

গল্প শেষ করে তৃতীয় বন্ধুটি বলল, 'তুমি শিক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞান তোমার আছে, কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞান তোমার নেই। তাই অতি লোভ করতে গিয়ে বিপদে পড়েছ। শুধু তাই নয়, একবার ব্যবহারিক জ্ঞানহীন চারজন ব্রাহ্মণপুত্র কিভাবে তোমার মত হাস্যাস্পদ হয়েছিল শোন।'

এই বলে তৃতীয় বন্ধুটি বলতে লাগল 'পণ্ডিত মূর্খ'-এর গল্প।

পণ্ডিত মূর্খ

কান্যকুব্জ থেকে শাস্ত্রপাঠ শেষ করে চার ব্রাহ্মণপুত্র একসঙ্গে দেশে ফিরে আসছিল। যাত্রার সময় গুরুকে প্রণাম করে যখন তারা বিদায় নিল, তখন গুরু আশীর্বাদ করে বলে দিলেন, 'বৎসগণ,

যে-বিদ্যা এতদিন আমার কাছে শিখেছ, জীবনের সকল কাজে তার ব্যবহার করো।'

গুরুর এই উপদেশ তারা রক্ষা করেছিল। কিন্তু শাস্ত্রবাক্যের আক্ষরিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা মারাত্মক ভুল করে বসল।

সেই চারবন্ধু কিছু দূর এসে থমকে দাঁড়াল। তারা দেখল, এক বণিকের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অপর কয়েকজন বণিক বা মহাজন মিলে। তা দেখে ব্রাহ্মণপুত্রেরা বলল, 'শাস্ত্রে আছে, মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ। মহাজনেরা যে পথে গেছেন তা-ই পথ। অতএব এস আমরা এই মহাজনদের পিছনে পিছনে যাই।'

শবযাত্রীদের সঙ্গে তারা শ্মশানে গিয়ে হাজির হল। শ্মশানে গিয়ে তারা একটি ধোপার গাধাকে দেখতে পেল। একজন অমনি শাস্ত্র আওড়ে বললঃ

'উৎসবে ব্যসনে চৈব, দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥

অর্থাৎ, সুদিনে, দুর্দিনে, দুর্ভিক্ষে বা রাষ্ট্রবিপ্লবে, বিচারালয়ে বা শ্মশানে যিনি সঙ্গে থাকেন, তিনি বান্ধব। অতএব এই গাধাটি আমাদের একটি বান্ধব।'

তখন সকল বন্ধু গিয়ে গাধাটিকে জড়িয়ে ধরল। কেউ তাকে আদর করতে লাগল। কেউ নদী থেকে জল এনে তার পা ধুয়ে দিতে লাগল।

এমন সময়ে কোথা থেকে একটা উট ছুটতে ছুটতে সেই দিকে এল। উটকে দেখে এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করল, 'ইনি কে?'

অপর একজন বন্ধু বলল, 'ইনি নিশ্চয় ধর্ম। শাস্ত্রে আছে ধর্মস্য ত্বরিতা গতিঃ। অর্থাৎ ধর্মের গতি দ্রুত।'

অন্য বন্ধুরাও স্বীকার করল যে, এই উট ধর্ম ছাড়া আর কেউ

নন। তারা একবাক্যে বলে উঠল, 'ইষ্টং ধর্মেণ যোজয়েৎ।—ইষ্টকে ধর্মের সঙ্গে যোগ করতে হয়।'

তাই তারা ইষ্ট গাধা আর ধর্ম উটকে একসঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলল।

গাধাটার বোধ হয় এত সব কাজ ভালো লাগছিল না। তাই সে প্রতিবাদ করার জন্য ভীষণ বিকট চিৎকার জুড়ে দিল। তার চিৎকার শুনতে পেয়ে ধোপা ছুটে এসে ব্রাহ্মণপুত্রদের তাড়া করল। তারা ছুটে নদীর দিকে গেল।

নদীর তীরে বাঁধা ছিল ছোট্ট একটা নৌকা। ব্রাহ্মণপুত্রেরা ছুটে গিয়ে সেই নৌকায় উঠে বাঁধন খুলে দিল। তারা ভাবল, এই নৌকার সাহায্যেই তারা নদী পার হয়ে ওপারে যাবে।

ধোপার ভয়ে ভীত হয়ে ব্রাহ্মণপুত্রেরা জোরে নৌকা চালিয়ে দিল। দেখতে দেখতে নৌকা গেল মাঝনদীতে। এমন সময়ে এক বন্ধু দেখল, একটা পলাশের পাতা ভেসে আসছে। তাই দেখে তার একটা শ্লোক মনে পড়ে গেল। সে বলল, 'আগমিষ্যতি যৎ পত্রং তদস্মাংস্তারয়িষ্যতি'—যে পত্র আসবে, তা-ই আমাদের ত্রাণ করবে!'

এই বলে সে লাফ দিয়ে সেই ভাসমান পলাশ পাতাটির ওপর লাফিয়ে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল।

বিপদ দেখে অন্য বন্ধুরা হতভম্ব হয়ে গেল। বন্ধু ডুবে যাচ্ছে, সর্বনাশ উপস্থিত! এখন কী করা উচিত? এ-বিষয়ে শাস্ত্র কি বলে? এক বন্ধু বলল, 'শাস্ত্র বলে, সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ, অর্থাৎ সর্বনাশ উপস্থিত হলে পণ্ডিতেরা অর্ধেক ত্যাগ করেন। কেননা অপর অর্ধেক দিয়েও কাজ চলতে পারে।'

এই বলে সে নৌকায় পাওয়া একটা দা দিয়ে নিমজ্জমান বন্ধুর মুণ্ডচ্ছেদন করে ফেলল।

তিনবন্ধু অবশিষ্ট রইল। নদী পার হয়ে সেই তিনবন্ধু এক

গ্রামের মধ্যে গেল। গ্রামে গিয়ে তারা এক গৃহস্থবাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করল।

গৃহস্থ অতিথিদের নানারকম অন্ন-ব্যঞ্জন ও পিঠে-পায়স দিয়ে আপ্যায়ন করলেন।

খেতে খেতে একবন্ধু দেখল, তার ব্যঞ্জনে রয়েছে একটি লম্বা সুতো।

তখন তার মনে পড়ে গেল, 'দীর্ঘসূত্রী বিনশ্যতি', অর্থাৎ যে দীর্ঘসূত্রী, তার বিনাশ হবে। নিজের বিনাশের কথা চিন্তা করে সে না খেয়েই উঠে পড়ল।

অপর একবন্ধু দেখল, তার পাতে রয়েছে সচ্ছিদ্র পিঠা। সে বলে উঠল, 'ছিদ্রেনানর্থা বহুলী ভবতি, অর্থাৎ ছিদ্রই অনেক অনর্থের মূল। অতএব ওহে বন্ধু, আহার ত্যাগ করে উঠে এস।'

এইভাবে তিনবন্ধুই আহার ছেড়ে উঠে পড়ল।

পণ্ডিতদের অদ্ভুত কথা আর কাজের পরিচয় পেয়ে গাঁয়ের লোকেরা হাসতে লাগল।

ক্রমে পণ্ডিতমূর্খদের বোকামির আরও অনেক কথাই জানা গেল। পণ্ডিত হয়েও তারা উপহাসের পাত্রই হল।

গল্প শেষ করে সেই তৃতীয় বন্ধুটি বলল, 'তোমার অবস্থাও এই রকমই হয়েছে। যে শুনবে তোমার বোকামির কথা, সে-ই হাসবে।'

চক্রধারী চতুর্থ বন্ধুটি বলল, 'বন্ধু, আমার উপায় করতে পার কিন্তু সবই দৈবের অধীন। দেখ, বুদ্ধিমানেরাও বিপদে পড়েন। একবার সহস্রবুদ্ধি মাছের কথা ভেবে দেখ।'

তৃতীয় বন্ধুটি বলল, 'সহস্রবুদ্ধির কি হয়েছিল?'

তখন চক্রধারী চতুর্থ বন্ধুটি বলতে লাগল 'সহস্রবুদ্ধির বিপদ'-এর গল্প।

সহস্রবুদ্ধির বিপদ

কতকালের একটা দীঘি ছিল। লোকে বলত তালদীঘি। তাল-দীঘিতে ছিল অনেক মাছ। দীঘির অগাধ জলে মাছেরা সুখে খেলা করত।

শতবুদ্ধি আর সহস্রবুদ্ধি ছিল সেই পুকুরের দুই ধেড়ে মাছ। কতরকম সাঁতার তারা জানত! আত্মরক্ষার অনেক কৌশলও তাদের জানা ছিল। তাদের বুদ্ধিকৌশলের কোনও লেখা-জোখা ছিল না। তারা দেমাক করে বলত, মাছেদের মধ্যে আমাদের মত বুদ্ধিমান আর নেই।'

সেই বুদ্ধিমান মাছেদের বন্ধু ছিল এক ব্যাঙ। তার নাম ছিল একবুদ্ধি। একবুদ্ধি সপরিবারে সেই পুকুরের কিনারে বাস করত। মাছেরা একবুদ্ধির কাছে গভীর জলের গল্প বলত। একবুদ্ধি ব্যাঙ বলত ডাঙার খবরাখবর।

একবুদ্ধি মাছদের ডেকে বলল, 'শুনেছ শতবুদ্ধি, শুনেছ সহস্রবুদ্ধি, জেলেরা বলে গেছে কাল সকালে এসে তারা এ-পুকুরের সব প্রাণীকে ধরে নিয়ে যাবে। একটি প্রাণীকেও রেহাই দেবে না। এখন কী করা উচিত?'

শতবুদ্ধি বলল, 'এতে ভয়ের কোন কারণ দেখছি না। জেলেদের চেয়ে আমরা কম বুদ্ধি রাখি না। এমন প্যাঁচ কষব যে, জেলেদের জাল টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাবে।'

সহস্রবুদ্ধি বলল, 'কেন ঘাবড়াচ্ছ, বন্ধু? জেলেরা আসুক, পরে দেখা যাবে। উচিত অনুচিত তখন ঠিক করা যাবে। কত কত জেলে দেখেছি, ফুঃ!'

একবুদ্ধি ব্যাঙ বলল, 'বন্ধু হে, তোমাদের তো অনেক বুদ্ধি আছে, কিন্তু আমার মাত্র এক বুদ্ধি। বিপদের সময়ে তোমরা বুদ্ধির জোরে পালাতে পারবে, আমার কিন্তু আগে থেকেই সাবধান হতে হবে।'

এই বলে ব্যাঙ তার স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে রাস্তার ধারের ছোট ডোবাটায় চলে গেল।

পরদিন ভোরবেলা জেলেরা এসে তালদীঘিতে জাল ফেলল।

শতবুদ্ধি আর সহস্রবুদ্ধির তখনও নিজেদের বুদ্ধির উপর খুব বিশ্বাস ছিল। তারা ভেবেছিল, তারা কৌশলে জাল থেকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু যতই কৌশল তারা করল, ততই তারা বেশি করে জালে জড়িয়ে পড়ল। শেষে এমন হল যে, জেলেরা সহজেই তাদের ধরে ফেলল।

অন্যান্য মাছের সঙ্গে শতবুদ্ধি আর সহস্রবুদ্ধিকেও তারা বাড়ি নিয়ে চলল। এত বড় বড় দুটি মাছ পেয়ে জেলেরা খুব খুশী হয়েছিল। শতবুদ্ধি একটু বেশি ভারী ছিল, তাই এক জেলে তাকে মাথায় করে বয়ে নিয়ে চলল। অপর একজন সহস্রবুদ্ধিকে হাতে ঝুলিয়ে নিল।

একবুদ্ধির সেই ডোবাটার ধার দিয়েই পথ। সেই পথেই জেলেরা যাচ্ছিল। এমন সময় একবুদ্ধি ব্যাঙ তার গিন্নীকে ডেকে বলল, 'দেখ গিন্নী, শতবুদ্ধি মাথায় রয়েছে, আর বেচারা সহস্রবুদ্ধি ঝুলে আছে। আমি মাত্র একবুদ্ধি, তাই বেঁচে গেলাম।'

গল্প শেষ করে চক্রধারী চতুর্থ বন্ধু বলল, 'তাই বলছিলাম বন্ধু, সবই অদৃষ্ট। অদৃষ্টে থাকলে বুদ্ধিমানেরাও বিপদে পড়েন।'

তৃতীয় বন্ধুটি বলল, 'তোমার কথা বুঝলাম, কিন্তু তুমি যদি আমার কথা শুনতে, তবে আর এমনটি হত না। বন্ধুর কথা না শুনে একটি গাধার কি হয়েছিল, জান তো?'

চতুর্থ বন্ধু জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছিল, বল শুনি।'

তখন তৃতীয় বন্ধুটি বলতে শুরু করল 'গর্দভ-রাগিণী'-র কাহিনী।

গর্দভ রাগিণী

চুরি করে কাঁকুড় খেতে গিয়েছিল দুই বন্ধু—এক গাধা আর এক শিয়াল।

ঠিক দুপুর বেলা ক্ষেতের মালিক তখন ঘুমোচ্ছে তার ঘরে।

এই সুযোগে গাধা আর শিয়াল মিলে কাঁকুড়ের ক্ষেতে ঢুকে সাধ মিটিয়ে কাঁকুড় খেতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে গাধা শিয়ালকে ডেকে বলল, 'শিয়াল-বন্ধু, আজ আমি অনেক কাঁকুড় খেয়েছি. আঃ কি স্বাদ কাঁকুড়গুলোর!'

শিয়াল চুপি চুপি বলল, 'আস্তে কথা কও, বন্ধু। তুমি চাও তো রোজ দুপুরে এসে আমরা কাঁকুড় খেয়ে যেতে পারি।'

গাধা বলল, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। আহা, পেট পুরে খেলেই আমার গান গাইতে ইচ্ছে হয়! এখন একটা গান গাই?'

শিয়াল বাধা দিয়ে বলল, 'এমন কর্ম কোরো না। এতে বিপদের আশঙ্কা আছে। গান গাইবার এমন শখ নিয়ে পরের ক্ষেতে কাঁকুড় খেতে আসতে নেই। চোরের যদি কাশির রোগ থাকে, তার যদি ঘুমকাতুরে স্বভাব কিংবা বেশি কথা বলার অভ্যাস থাকে, তবে তার বিপদ হবে নির্ঘাত। আমরা এসেছি চুরি করতে, গান গাওয়া দূরে থাক, কথা বলাও উচিত নয় আমাদের। তা ছাড়া, তোমার গলাটাও খুব মিষ্টি নয়।'

গাধা অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'কী, আমার গলা মিষ্টি নয়? গর্দভ-রাগিণীর চেয়ে মিষ্টি রাগিণী আর আছে নাকি?'

গাধা রাগ করে আরও বলতে লাগল, 'গানের তুমি কি জান, আর কি বোঝ? শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন, গানের চেয়ে ভালো আর কিছুই নেই। গানের সাত স্বর, তিন গ্রাম, একুশ মূর্ছনা, ঊনপঞ্চাশ তাল, তিন মাত্রা, তিন লয়। জান এসব কথা? আরও বলছি শোন, গানের বিরামস্থান তিনটি, মূল ছয়টি, রস নয়টি, রাগ ছত্রিশটি, ভাব চল্লিশটি, আর অঙ্গ একশ'প'চাশিটি।'

শিয়াল বলল, 'গানের বিষয়ে এত কথা শুনে বড় খুশী হলাম। কিন্তু বন্ধু সঙ্গীতশাস্ত্রে গানের স্থানকাল সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে

কি? বলতে পার, চুরি করতে এসে কোন্ রাগ-রাগিণী গাওয়া উচিত?'

গাধা বলল, 'তোমার মত অরসিককে কী আর বলব! আমি গান করি, আর তুমি কেবল শোন।'

শিয়াল বলল, 'একটু অপেক্ষা কর বন্ধু। আমি ক্ষেতের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। গান শুনতেও পাব, আর চাষী এলে তাকে দেখতেও পাব।'

এই বলে স্বভাবচতুর শিয়াল গিয়ে নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে রইল।

বেশি কাঁকুড় খেয়ে পেট-ভার হওয়ায় গাধা বসে পড়ল আরাম করে।

তারপর গাধা গান জুড়ে দিলে মনের আনন্দে। আহা হা, সে কী গান!

সেই গানের ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী চাষীর কানে যেতেই সে তাতে মুগ্ধ না হয়ে বেশ মোটা একটা লাঠি নিয়ে ছুটে এল।

চাষীকে আসতে দেখে শিয়াল ঝোপের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে রইল, আর গানে মত্ত সেই গাধা তার গানের উপযুক্ত পুরস্কার পেল। চাষীর লাঠির আঘাতে তার পিঠ ভেঙে গেল।

গল্প শেষ করে তৃতীয় বন্ধু বলল, 'আমিও তোমায় নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তুমি লোভের বশবর্তী হয়ে আমার কথা গ্রাহ্য কর নি। যার নিজের বুদ্ধি নেই, যে বন্ধুর বুদ্ধিও নেয় না, সে মন্থরকের মতই মরে।'

চক্রধারী বন্ধুটি জানতে চাইল, মন্থরক কে আর কেমন করেই বা সে মরেছিল।

তখন তৃতীয় বন্ধু বলতে লাগল 'স্ত্রীবুদ্ধি'-র গল্প।
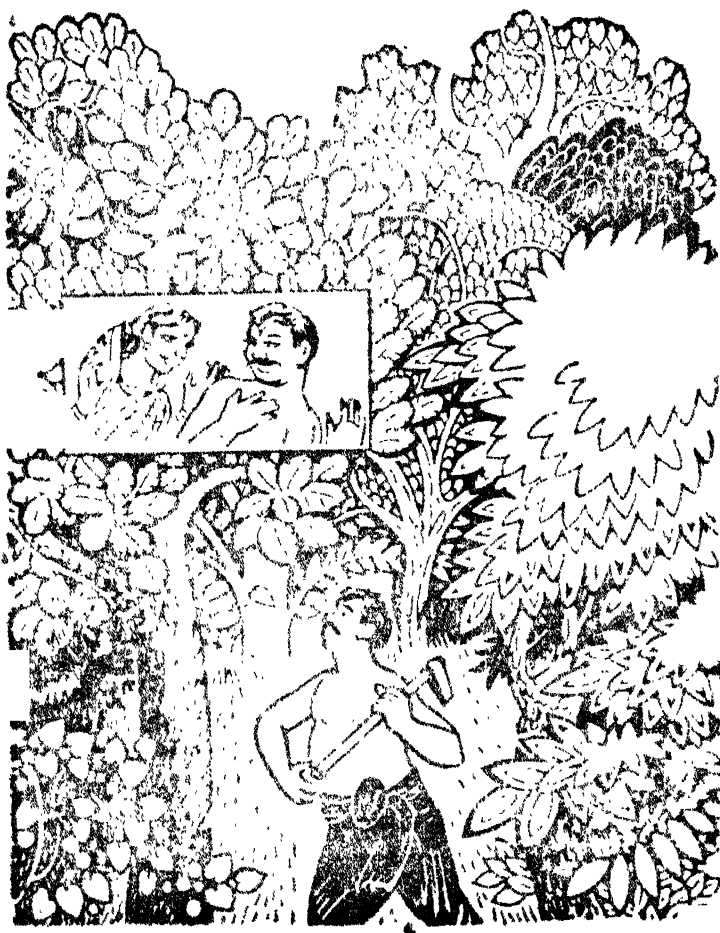
স্ত্রীবুদ্ধি

কোন গাঁয়ে ছিল এক তাঁতী আর তাঁতী-বৌ। তাঁতী উদয়াস্ত কাপড় বুনে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালায়। আহা কী দুঃখের কপাল দেখ! একদিন তাঁত চালাতে চালাতে হঠাৎ তার তাঁতটা গেল ভেঙে!

অনেক ভেবেচিন্তে তাঁতী একটা কুড়ুল নিয়ে উঠে পড়ল। সে বলল, 'দুঃখ করিস না, বৌ। বন থেকে গাছ কেটে এনে ভালো একটা তাঁত তৈরী করব দুদিনে।'

এই বলে সে বনের দিকে চলল।

বনে ছিল একটা পুরানো শালগাছ। তাঁতী গিয়ে সেই গাছটাকেই কাটতে লাগল। এমন সময় কে যেন তাকে ডেকে বলল, 'ওহে তাঁতী, এ গাছটা কেটো না।'

তাঁতী কাউকে দেখতে না পেয়ে অবাক হয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে কথা বলছ? আমি তো তোমায় দেখতে পাচ্ছি না! আমার তাঁতের জন্য এই গাছটা চাই।'

উত্তর হল, 'আমি যক্ষ। আমি এই গাছে আছি অনেকদিন ধরে। তাই বলছি, তুমি এ-গাছটা না কেটে অন্য একটা গাছ কাট। বরং আমি তোমায় একটা বর দেব যদি এ গাছটা না কাট। বল, তুমি কি বর চাও?'

তাঁতী নমস্কার করে বলল, 'এতই যদি দয়া করবে, তা হলে একটু অপেক্ষা কর যক্ষ। আমি বৌয়ের কাছে জিজ্ঞেস করে আসি।'

যক্ষ বলল, 'বেশ তাই কর।'

আনন্দে ছুটতে ছুটতে তাঁতী এল বাড়ির দিকে। পথে গাঁয়ের নাপিতের সঙ্গে তার দেখা। নাপিত বলল, 'এত ছুটে কোথায় যাচ্ছ, ভাই?'

তাঁতী নাপিতের কাছে সব খুলে বলল। তার পর জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি করি নাপিত ভাই? কোন্ বর চাইব?'

নাপিত বলল, 'এজন্য ভাবনা কি? তুমি গিয়ে রাজা হওয়ার বর চাও। তুমি রাজা হলে আমায় কোরো তোমার মন্ত্রী। দেখো, কেমন সুখে আমরা রাজত্ব করি।'

তাঁতী বলল, 'ঠিক বলেছ ভায়া, কথাটা আমার মনেই ছিল না ; বৌকে একবার জিজ্ঞেস করে আসি, সে কি বলে।'

এই বলেই এক দৌড়ে তাঁতী এসে গেল তার বাড়িতে।

ঘরে এসে তাঁতী হাঁপাতে লাগল। তার বৌ বলল, 'এত হাঁপাচ্ছ কেন গো ? কী হয়েছে ?'

তাঁতী বলল, 'বউ, রাজা হয়ে গেছি ! তুই হবি রানী—রাজরানী !'

বৌ বিরক্ত হয়ে বলল, 'বলি তোমার মাথাটা খারাপ হয় নি তো ? আমি কেন রাজরানী হতে যাব ?'

তখন তাঁতী সব খুলে বলল, যক্ষের বর দেওয়ার কথা আর নাপিতভায়ার পরামর্শের কথা। সব শুনে তাঁতী-বৌ তো আহ্লাদে আটখানা।

তাঁতী বলল, 'তা হলে রাজা হওয়ার বরই চেয়ে নিই, কেমন ?'

তাঁতী-বৌ বলল, 'নাপিতভায়া তোমায় মোটেই ভাল বুদ্ধি দেয় নি। কে জানে, তার পেটে কী বুদ্ধি আছে ? তা ছাড়া, দেখ না, রাজা হওয়ার কত ঝামেলা ! তাতে বিপদও আছে, ভাবনাও আছে। অতএব তুমি আমি সে ঝক্কি সামলাতে পারব কেন ?'

তাঁতী বলল, 'কেন, রাজা হওয়ায় আবার বিপদটা কিসের ?'

তাঁতী-বৌ বলল, 'এটুকুও বোঝ না ? তুমি আবার করবে রাজত্বি ! রামচন্দ্রের বনবাস, পাণ্ডবদের নির্বাসন, নল রাজার রাজ্য-নাশ, রাবণের দুর্গতি—এ-সব কথা কি ভুলে গেছ ? রাজা হওয়ার ঝামেলা কম মনে করেছ ?'

তাঁতী এতক্ষণে যেন বুঝতে পারল যে, সত্যি রাজা হওয়ার অনেক ঝামেলা। তাই সে বলল, 'বৌ, তুই বড় বুদ্ধিমতী। তা হলে কি চাইব ?'

প্রশংসায় তাঁতী বৌয়ের বুদ্ধি যেন আরও খুলে গেল। সে বলল, 'দেখ, আমরা তাঁতী। তাঁত চালিয়ে আমাদের খেতে হবে।

দুটো হাতে মানুষ কত কাপড় বুনতে পারে? তুমি গিয়ে যক্ষের কাছে চারটে হাত আর দুটো মাথা চেয়ে নাও। চার হাতে কাজ করলে অনেক কাপড় বুনতে পারবে. অভাবও আমাদের কিছু থাকবে না।'

তাঁতী বলল, 'ঠিক কথা বলেছিস, বৌ।'

যক্ষের বরে চারটে হাত আর দুটো মাথা পেয়ে তাঁতী খুশী হয়ে বাড়ির দিকে আসতে লাগল।

পথের উপর গাঁয়ের ছেলেরা খেলা করছিল। তারা চার হাত আর দুমাথাওয়ালা তাঁতীকে দেখে. 'রাক্ষস রাক্ষস' বলে চিৎকার করে যে যার ঘরে পালিয়ে গেল।

তাদের চিৎকার শুনে গাঁয়ের লোকেরা লাঠি-সোটা নিয়ে রাক্ষস মনে করে তাঁতীকে মেরে ফেলল।

গল্প শেষ করে তৃতীয় বন্ধু বলল, 'বন্ধু. নাপিতের কথা না শুনে তাঁতীর যে-অবস্থা হয়েছিল, আমার কথা না শুনে তোমার অবস্থাও অনেকটা তা-ই হল। তুমি বলছিলে যে, দৈবের ইচ্ছায় সব কাজ হয়ে থাকে, ভালোমন্দ সব দৈবের ইচ্ছায় ঘটে। কিন্তু নিজের নির্বুদ্ধিতাই অনেক অমঙ্গলের কারণ হয়ে থাকে। তোমায় ভারুন্ড পাখীর গল্পটা বলছি।'

চক্রধারী বন্ধুটি বলল, 'বল, যতক্ষণ তুমি কাছে থাকবে, ততক্ষণই আমার আনন্দ।'

তখন তৃতীয় বন্ধুটি বলতে লাগল 'দুমুখো পাখী'-র গল্প।

দুমুখো পাখী
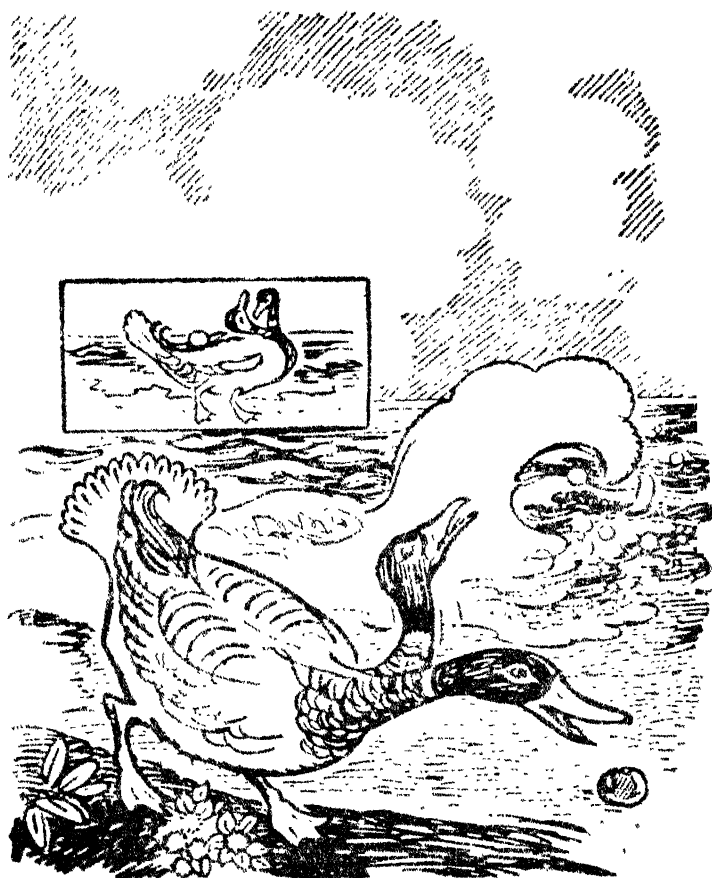
ভারুণ্ড নামে এক সুন্দর পাখী ছিল। তেমন সুন্দর পাখী সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। অন্য পাখীদের সঙ্গে তার কেবল চেহারার পার্থক্য ছিল না, আকৃতিরও পার্থক্য ছিল। সেই সুন্দর ভারুণ্ড পাখীটার ছিল দুটো গলায় দুটো মাথা।

সমুদ্রের ধারে ভারুণ্ড দিনরাত ঘুরে বেড়াত। সমুদ্রের জলে মাঝে মাঝে দেশ-বিদেশ থেকে যে-সব ফল-মূল ভেসে আসত, তা-ই সে খেত। সমুদ্র-তীরে এমনি একদিন ঘুরতে ঘুরতে সেই ভারুণ্ড পাখীর একটা মুখ দুটো মিষ্ট ফল ভেসে আসতে দেখে ঠোঁটে করে তা তুলে নিল।

আহা! সেই ফলের কী মধুর স্বাদ! একটা ফল খেয়েই প্রথম মুখটা বলে উঠল, 'আঃ, এমন চমৎকার ফল আগে কোনদিন খাই নি! যেমন মিষ্টি, তেমনি রসাল, এ যেন অমৃতফল!'

দ্বিতীয় মুখ বলল, 'তা হলে যে-ফলটা আছে, সেটা আমায় দাও। আমিও অমৃতফল খেয়ে দেখি।'

প্রথম মুখ তখন বলল, 'ও-ফলটা বউয়ের জন্য রেখেছি। সে নিশ্চয় ফলটা পেয়ে খুশী হবে।'

দ্বিতীয় মুখ বলল, 'তোমার কাছে বউকে খুশী করা বেশি হল! আমিও তো কোনদিন অমৃত ফল খাই নি। ওটা আমায় দাও।'

প্রথম মুখ বলল, 'কেন রাগ করছ? তুমি আর আমি তো এক। আমি খেলেই তোমার খাওয়া হল। কাজেই ফলটা বউয়ের জন্যে থাক।'

দ্বিতীয় মুখ মনে মনে খুব অসন্তুষ্ট হল প্রথম মুখের উপর। সে রেগে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করল, যেমন করেই হোক প্রথম মুখকে সে জব্দ করবেই।

কিছুদিন পরের কথা।

সমুদ্রের জলে ভেসে-আসা একটা বিষফল পেল দ্বিতীয় মুখ! সে বলল প্রথম মুখকে, 'আমায় অমৃতফল না দেবার শাস্তি আজ তোমায় দেব। এখন আমি বিষফলটা খাব।'

প্রথম মুখ বলল, 'দোহাই তোমার, দ্বিতীয় মুখ। এমন কাজ কোরো না। এতে দুজনেরই বিপদ।'

কিন্তু কার কথা কে শোনে। রাগে সে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে বিষফল খেল। সঙ্গে সঙ্গে ভারণ্ড পাখীর মৃত্যু হওয়ায় দুমুখের ঝগড়া চিরদিনের জন্য ঘুচে গেল।

গল্প শেষ করে তৃতীয় বন্ধু বলল, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করব না। নির্বুদ্ধি ভারণ্ডের মত তোমার জন্য শোক করে লাভ নেই।'

চতুর্থ বন্ধু বলল, 'যাবে যাও। আমার জন্য আর কতকাল কে দাঁড়িয়ে থাকবে? তবে ভাই একা যেও না। লোকে বলে, একা একা মিষ্টি খেতে নেই, অন্যলোক ঘুমিয়ে পড়লে একা জেগে থাকতে নেই, একা পথ চলতে নেই, আর কোন গুরুতর বিষয়ে একা চিন্তা করতে নেই। তাই বলছি, যা হোক কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাও। কাঁকড়াকে সঙ্গীরূপে নিয়েও একজনের জীবন রক্ষা পেয়েছিল।'

তৃতীয় বন্ধু জিজ্ঞাসা করল, 'কাঁকড়া সঙ্গে থেকে কেমন করে সেই লোকটির জীবন বাঁচল?'

তখন চক্রধারী চতুর্থ বন্ধু বলতে লাগল 'কাঁকড়া-সঙ্গী'-র কাহিনী।

কাঁকড়া সঙ্গী

ছেলে বিদেশে যাচ্ছে।

মা বললেন, 'বাছা, আমি আশীর্বাদ করি, তোমার কল্যাণ হোক। কিন্তু বাছা একা বিদেশে যেতে নেই। তাই কাঁকড়াটি ধরে এনেছি, একে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।'

ছেলে বলল, 'কাঁকড়াকে সঙ্গে নিয়ে কী হবে? তা ছাড়া, একে আমি রাখিই বা কোথায়?'

মা বললেন, 'তোমার বোঁচকার মধ্যে যে কর্পূরের কৌটো আছে, তাতে করেই এই সঙ্গীকে নিয়ে যাও।'

ছেলে তাই করল।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি রওনা হল। হাঁটতে হাঁটতে দুপুরবেলায় সূর্যের উত্তাপে আর পথশ্রমে ছেলেটি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

পথের ধারে ছিল একটা বড় গাছ। তারই ছায়ায় বসে সে বিশ্রাম করতে লাগল। গাছের ছায়ায় আর ঠাণ্ডা বাতাসে তার শরীর জুড়িয়ে গেল, তার চোখ বুজে এল। গাছের গায়ে পিঠ ঠেস দিয়ে বসে সে কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়তেই, কোথা থেকে বেরিয়ে এল একটা মস্ত বড় সাপ। ফণা বিস্তার করে সাপটা ছেলেটির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কিন্তু বোঁচকাটার কাছে আসতেই কর্পূরের গন্ধে সে আকৃষ্ট হল। কর্পূরের গন্ধ সাপ খুব পছন্দ করে। তাই কর্পূরের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে সে বোঁচকার ভিতর থেকে কৌটোটা খুঁজে বের করে ফেলল। কৌটোটাকে বের করে এনে সে তা মাটিতে ঠুকতে লাগল।

কৌটোটা খুলে কর্পূর খাবে, সাপটির এই ইচ্ছে। মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে ঠুং করে কৌটোটা গেল খুলে, আর তার ভিতর থেকে কাঁকড়াটি বের হয়ে তার বড় বড় দুটো দাড়া দিয়ে সাপের গলা এমন জোরে চেপে ধরল যে, তাতেই বেচারা সাপ মরে গেল।

ছেলেটি কিন্তু এত সব কাণ্ডের কিছুই টের পেল না। সে যখন

জেগে উঠল, তখন আর বেশি বেলা নেই। পড়ন্ত বেলার দিকে চেয়ে সে বলল, 'ইস্! আর যে বেলা নেই!'

তারপর উঠতে গিয়ে সে যেমনি বোঁচকার দিকে তাকাল, তখনি তার চোখে পড়ল—খোলা কর্পূরের কৌটো, মরা সাপ আর কাঁকড়াটি। তখন সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তার সঙ্গী কাঁকড়াটিকে ধন্যবাদ দিল, আর তার মায়ের উদ্দেশে প্রণাম জানাল।

গল্প শুনে চক্রধারী বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুবর্ণপ্রাপ্ত বন্ধুটি নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

॥ পঞ্চতন্ত্র সমাপ্ত ॥

—এই গ্রন্থমালার অন্যান্য বই—

কথাসরিৎসাগরের গল্প। কৃষ্ণধন দে

রঘুবংশের গল্প। কৃষ্ণধন দে

নলোদয়ের গল্প। কৃষ্ণধন দে

পঞ্চতন্ত্রের গল্প, প্রথম খণ্ড। প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

পঞ্চতন্ত্রের গল্প, দ্বিতীয় খণ্ড। প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

পঞ্চতন্ত্রের গল্প। পূর্ণাঙ্গ। প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

মঙ্গলকাব্যের গল্প, প্রথম খণ্ড। প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

মঙ্গলকাব্যের গল্প, দ্বিতীয় খণ্ড। প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

জাতকের গল্প। কবিশেখর কালিদাস রায়

রামায়ণের গল্প। ঋষি দাস

মহাভারতের গল্প। যামিনীকান্ত সোম

কথামালার গল্প। অশোককুমার